ইছলাহুল মুসলিমীন

মূল

হাকিমুল উম্মত হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)

সংকলনে

অধ্যাপক হাফেজ মাসুদ আহসান
ইসলামিয়া কলেজ, করাচী, পাকিস্তান।

অনুবাদ

এস, এম, আবদুল গাফফার
বি.এ. (অনার্স), এম. এ (ডবল)
মোমতাজুল মুহাদ্দিসীন
প্রভাষক, মাদ্রাসা-ই আলিয়া, ঢাকা।

হাবিবিয়া বুক ডিপো
১৬, আদর্শ পুস্তক বিপণী বিতান
বায়তুল মোকররম, ঢাকা-১০০০

প্রকাশকের কথা

আলহামদুল্লিাহ! হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর প্রণীত "ইসলাহুল মুসলিমীন" গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ অবশেষে প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করছি। যদিও গ্রন্থটির অনুবাদ ১০ বৎসর আগেই করে রেখেছিলাম কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে এতদিন বইটি ছাপা সম্ভব হয়নি।

বর্তমান গ্রন্থটিতে হযরত (রহঃ)-এর এমন কিছু বিষয় এর উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন যে সমস্যাগুলো আজকের মুসলিম সমাজের গুরুতর সমস্যা রূপে দেখা দিয়েছে। তাই আমরা বর্তমান সময়ে দিশেহারা মুসলিম সমাজের কিছু উপকার হবে এই আশা করে গ্রন্থটি তাদের হাতে তুলে দিলাম।

গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ হিসেবে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। পাঠক সমাজের সহযোগিতায় পরবর্তী সংস্করণে ভুলগুলো শুধরে দেবার আশা রাখি ইনশাঅল্লাহ।

সবশেষে বইটি পাঠক সমাজের কাছে গ্রহণীয় হবে, পরম করুণাময়ের দরবারে এইটুকু ভরসা।

বিনীত
প্রকাশক

সূচীপত্র

দ্বিতীয় পাঠঃ জনসেবা

তৃতীয় পাঠঃ জীবন ও স্বাস্থ্য

চতুর্থ পাঠঃ কাফেরদের অনুকরণ

পঞ্চম পাঠঃ দেশাচার ও প্রথা

ষষ্ঠ পাঠঃ পর্দা ও পর্দাহীনতা

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ অর্থনীতি

প্রথম পাঠঃ ইসলাম ও প্রগতি

দ্বিতীয় পাঠঃ সম্পদ ব্যয়ের সীমা

তৃতীয় অধ্যায় ঃ রাজনীতি

প্রথম পাঠ ঃ জাতীয় স্বাতন্ত্র্য

দ্বিতীয় পাঠঃ ঐক্য ও অনৈক্য

প্রথম অধ্যায় ঃ সমাজনীতি

প্রথম পাঠ

ইসলাম ও সামাজিক সদাচরণ

সমাজের হাকীকত ও গুরুত্ব

হামদ ও সালাতের পরে আরজ এই যে, দ্বীনের অঙ্গ পাঁচটি। আকীদাসমূহ, ইবাদাত, মোয়ামালাত (ব্যবহারিক বিষয়), বাতেনী আখলাক সংশোধন ও সামাজিক নীতিমালা। তন্মধ্যে প্রথম চারটির প্রতি ওলামা ও জনসাধারণ কোনও না কোন প্রকারে দৃষ্টি দিয়াছেন এবং ঐগুলিকে দ্বীনও মনে করিয়াছেন। কিন্তু সামাজিক নীতিমালাকে সাধারণতঃ দ্বীনের অঙ্গ মনে করা হয় না। বর্তমান যুগে আমাদের মধ্যে যে বিভেদ ও অনৈক্য পরিলক্ষিত হইতেছে আমার মতে উহার প্রধান কারণ সামাজিক অসদাচরণ। কারণ ইহাতে মানুষের মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষের উৎপত্তি হয়। সামাজিক নীতিমালা দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এ সম্পর্কে কয়েকটি প্রমাণ উপস্থাপন করা যাইতেছেঃ

"হে মুমিনগণ! যখন তোমাদিগকে মজলিসে জায়গা করিয়া দিতে বলা হয় তখন তোমরা মজলিসে জায়গা করিয়া দিও। আর যখন তোমাদিগকে উঠিয়া দাঁড়াইতে বলা হয় তখন তোমরা উঠিয়া দাঁড়াইও।" (সূরা মুজাদালা)

"অন্যের ঘরে (যদিও উহা পুরুষের একান্ত বসবাসের স্থান হউক না কেন) বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিও না।"

মহানবী (সঃ) বলেন– একত্রে আহারকালে নিজের ভোজনসঙ্গীদের অনুমতি না লইয়া একসঙ্গে দুইটি করিয়া খোরমা মুখে পুরিও না। এই সাধারণ ব্যাপারটিকে শুধুমাত্র এই জন্য নিষেধ করা হইয়াছে যে, ইহাতে অন্যরা অসন্তুষ্ট হয়।

মহানবী (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রসুন ও (কাঁচা) পেঁয়াজ খায় সে যেন আমাদের (মজলিস) হইতে দূরে থাকে। এখানেও অন্যান্যরা কষ্ট পাইবে বলিয়া কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুন খাইতে নিষেধ করা হইয়াছে। মহানবী (সঃ) আরও বলেন, অতিথির এই পরিমাণ অবস্থান সংগত নহে যাহাতে গৃহকর্তা বিরক্ত হইয়া যায়। মহানবী (সঃ) আরও বলেন, মানুষের সহিত একত্রে আহারকালে তোমার পেট ভরিয়া গেলেও অন্যদের খাওয়া শেষ হইবার পূর্বে তুমি হাত গুটাইয়া লইও না। কারণ ইহাতে অন্যরা লজ্জা পাইয়া তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া দিবে। আর এদিকে হয়তো তখনও তাহার খাওয়ার প্রয়োজন রহিয়া গিয়াছে। এই

হাদীসগুলো দ্বারা মহানবী (সঃ) এমন সব কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছে যাহাতে অন্যদের লজ্জা পাইবার আশংকা থাকে।

একবার হযরত জাবের (রাঃ) মহানবী (সঃ)-এর ঘরে আসিয়া দরজার কড়া নাড়িলেন। মহানবী (সঃ) ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? হযরত জাবের (রাঃ) বলিলেন, আমি। ইহাতে মহানবী (সঃ) বলিয়া উঠিলেন, আমি, আমি। ইহা দ্বারা মহানবী (সঃ) পেঁচালো কথা না বলিতে এবং সোজা কথা বলিতে শিক্ষা দিয়াছেন।

মহানবী (সঃ) বলেন, বিনা অনুমতিতে এমন দুই ব্যক্তির মধ্যে গিয়া বসা বৈধ নহে যাহারা (স্বেচ্ছায় পাশাপাশি) বসিয়া আছে। এই হাদীস দ্বারাও অন্যের ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এমন কাজ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, সাহাবাদের নিকট মহানবী (সঃ)-এর চেয়ে প্রিয় আর কেহ ছিলেন না। কিন্তু তবুও তাহারা মহানবী (সঃ)-এর আগমনে দণ্ডায়মান হইতেন না, কারণ মহানবী (সঃ) ইহা পছন্দ করিতেন না। এই হাদীস দ্বারা মুরুব্বিদের আদব ও তাজিম করিবার মূলনীতি জানা গেল। অর্থাৎ তাহাদের মেজাজ বিরুদ্ধ হয় এবং তাহারা পছন্দ করেন না এমন কোন কাজ তাহাদের সামনে করা অনুচিত। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মহানবী (সঃ) হাঁচি দেওয়ার সময় হাত বা কাপড় দ্বারা মুখ ঢাকিয়া লইতেন যাহাতে অন্যের কষ্ট না হয়।

মহানবী (সঃ)-এর দরবারে সাহাবীগণ যে যেখানে জায়গা পাইতেন তিনি সেখানেই বসিয়া যাইতেন এবং মহানবী (সঃ)-এর নিকটে আসিবার জন্য অনর্থক চেষ্টা করিতেন না। মহানবী (সঃ) মজলিসের এই আদবই শিক্ষা দিয়াছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, মহানবী বলিয়াছেন, রোগীর সেবা করিতে গিয়া তাহার পাশে বেশী সময় বসিয়া থাকিও না। কিছু সময় বসিয়া আবার উঠিয়া চলিয়া আসিও। একথাও বলার উদ্দেশ্য হইতেছে রোগীকে পেরেশানী হইতে মুক্তি দানের শিক্ষা প্রদান।

জুমার দিনে গোসল জরুরী কেন সে সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে অধিকাংশ সাহাবী দরিদ্র ও শ্রমজীবী ছিলেন। তাহারা ময়লা কাপড় পরিহিত থাকিতেন ও তাহাদের শরীর হইতে ঘাম বাহির হওয়ায় দুর্গন্ধ ছড়াইতে থাকিত। তাই ঐদিন গোসল ওয়াজেব করা হইয়াছে। অতঃপর এই ওয়াজেবের হুকুম পরে রহিত হইয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারাও বুঝা যায় যে, মানুষকে কষ্ট না দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হওয়া ওয়াজেব।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, মহানবী (সঃ) বিছানা হইতে আস্তে উঠিলেন, আস্তে না'লাইন (জুতা) পরিলেন। আস্তে কপাট খুলিলেন, আস্তে বাহিরে চলিয়া

গেলেন এবং আস্তে কপাট বন্ধ করিলেন। ইহা এই জন্য ছিল যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) নিদ্রিতা ছিলেন। এই ঘটনা দ্বারা নিদ্রিত ব্যক্তির প্রতি খেয়াল রাখার শিক্ষা পাওয়া যায়। এমনি আরও এক রেওয়ায়াতে দেখা যায় যে, শায়িত অতিথিকে মহানবী (সঃ) আস্তে সালাম করিয়াছেন যেন জাগ্রত ব্যক্তি সালাম শুনিতে পায় এবং নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গ না হয়। এই বিষয়ে আরও অনেক হাদীস রহিয়াছে। ফকীহগণ বলেন, কোন জরুরী কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে সালাম দিয়া ঐ কাজের প্রতি তাহার মনোযোগ নষ্ট করা অনুচিত।

এমনিভাবে ফকীহগণ বলেন যে, পাইওরিয়া রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে মসজিদে আসিতে দেওয়া অনুচিত।

এই সকল প্রমাণাদি সম্পর্কে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, মানুষের কষ্টের কারণ দূরীভূত করা অত্যন্ত জরুরী। শরীয়ত ইহাও বলে যে, কাহারও কোন আচরণ বা অবস্থা যেন কোন প্রকারে অন্যের কষ্ট বা ঘৃণার কারণ না হইয়া দাঁড়ায়। মহানবী (সঃ) শুধু নিজের কথা ও কাজের দ্বারাই উম্মতকে এই শিক্ষা প্রদান করেন নাই বরং এ বিষয়ে সাহাবীদের কম তাওয়াজ্জুহ থাকিলে তাহাদিগকে এই আদবগুলি আমল করিতে বাধ্যও করিয়াছেন। যেমন এক সাহাবী হাদিয়া লইয়া সালাম ও অনুমতি গ্রহণ ব্যতীতই মহানবী (সঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করিলেন। মহানবী (সঃ) বলিলেন, আগে বাহিরে যাও। অতঃপর "আসসালামু আলাইকুম। আমি কি আসিতে পারি?" বলিয়া আবার আস।

প্রকৃত প্রস্তাবে সৎ আখলাকের ভিত্তি একটিই এবং তাহা এই যে, কেহ যেন অপর কাহারও দ্বারা কষ্ট না পায়। এই কথাটিই মহানবী (সঃ) ব্যাপক ভিত্তিতে বলিয়াছেন। পূর্ণ মুসলমান ঐ ব্যক্তি যাহার মুখ এবং হাতের দ্বারা অপর মুসলমান কষ্ট না পায়। (বোখারী) অন্যকে যে কোন ধরনের (জান, মাল বা মর্যাদাগত) কষ্টে ফেলা অসৎ চরিত্র রূপে গণ্য।

গুরুত্বের দিক দিয়া সামাজিক সদাচরণের স্থান হওয়া উচিত আকায়েদ ও ইবাদতের পরে। কিন্তু যেহেতু আকায়েদ ও ইবাদতে ত্রুটি থাকিলে তদ্দ্বারা মানুষ নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর সামাজিক সদাচরণে ত্রুটি করিলে তদ্দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় অন্যান্য ব্যক্তিরা। তাই সামজিক সদাচরণের স্থান আকায়েদ ও ইবাদতের পূর্বে। আল্লাহ তায়ালা সূরা ফোরকানের ৬৩ আয়াতে বলেন, মুমিনদের চরিত্রের একটি দিক এই যে, তাহারা জমিনের উপর ধীর পদক্ষেপের সহিত চলাফেরা করে এবং মূর্খেরা তাহাদিগকে কিছু বলিতে চাহিলে তাহারা তদুত্তরে বলে– আমরা শান্তি চাই। এই আয়াতটিতে সামাজিক সদাচরণের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। ইহার পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ইবাদত সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ সামাজিক সদাচরণের গুরুত্ব

দেখানোর জন্যই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটিকে ইবাদতের পূর্বে আনিয়াছেন। এমনিভাবে হাদীসে এমন দুইজন নারীর উল্লেখ রহিয়াছে যাহাদের মধ্যে একজন যথেষ্ট নফল নামায রোযা আদায় করিত এবং অপরজন নফল ইবাদত কম করিত। মহানবী (সঃ) ইহাদের একজনকে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়ার কারণে দোযখী এবং অপরজনকে প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়ার কারণে জান্নাতী বলিয়াছেন।

মোটকথা, দ্বীনের অঙ্গসমূহের মধ্য হইতে সদাচরণের গুরুত্ব যে কতখানি তাহা প্রমাণিত হইল। দুঃখের বিষয় এই যে, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও ইহাকে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন না এবং কার্যতঃ এদিকে বেশী খেয়াল করেন না। (আদাবুল মোয়াশারাত– সংক্ষেপিত)

ভাল ও মন্দের মাপকাঠি

এ সম্পর্কে হযরত মাওলানা বলেন যে, কোন জিনিসের ভাল-মন্দ সম্পর্কে আল্লাহ যাহা বলিয়াছেন তাহাই মানিয়া নিতে হইবে। (আরজাউল গুযুব পৃষ্ঠা ঃ ২৭)

জাহেরী ও বাতেনী আমলের মাপকাঠি

আমাদের আমলের কেবলা হইতেছেন মহানবী (সঃ)। তাই যে আমলের গতি এই কেবলার দিকে হইবে উহা কবূল হওয়ার যোগ্য। আমাদের জাহেরী আমলের কেবলা মহানবী (সঃ)-এর জাহেরী আমল এবং আমাদের বাতেনী আমলের কেবলা মহানবী (সঃ)-এর বাতেনী আমল। (তরিকুল কালান্দার পৃষ্ঠা ঃ ১৫)

আমাদিগকে শিক্ষাদানের জন্য মহানবী (সঃ)-এর আগমন আল্লাহর রহমত স্বরূপ

ইহা আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী যে, তিনি আমাদের হেদায়াতের জন্য আদেশ ও নিষেধ সম্বলিত আসমানী গ্রন্থ প্রেরণ করিয়াছেন এবং মহানবী (সঃ)-কেও আদর্শ মানব বানাইয়াছেন যেন শরীয়তের হুকুম আহকাম শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন জটিলতার সৃষ্টি না হয়। শিক্ষাদানের একটি পদ্ধতি হইল মুখে মুখে বলিয়া দেওয়া, আরেকটি পদ্ধতি হইল হাতে কলমে কাজ করিয়া দেখানো। এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই উত্তম এবং প্রথম পদ্ধতিটি অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় না। (আল ইসলামুল হাকীকী, পৃষ্ঠাঃ ৩)

দ্বীন ও দুনিয়ার মর্যাদা

মুসলমানদের দ্বীন ও দুনিয়ার ইজ্জত মহানবী (সঃ)-এর অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। ইহা ব্যতীত আর সব পথ লাঞ্ছনার। (মলফুজাত, ২য় খণ্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

আমাদের বদ আমলের দরুন মহানবী (সঃ) কষ্ট পাইয়া থাকেন

অতীত যুগের সম্প্রদায় সমূহের নিকট নবীদের মাধ্যমে আল্লাহর বাণী পৌছিয়াছিল। আমাদের নিকট এই বাণী পৌঁছিয়াছে নবীদের ওয়ারিশগণের (ওলামাগণের) মাধ্যমে। অতীত যুগের সম্প্রদায়গণ আল্লাহর নাফরমানী করিয়াছিল। আর আমরাও নাফরমানী কম করি নাই। কবির ভাষায়–

ع – صورت ببیں حالت مپرس

কেহ যদি মহানবী (সঃ)-কে দেখিয়া থাকে এবং পরে সে আমাদিগকেও দেখে তবে সে আমাদিগকে নবী (সঃ)-এর উম্মত বলিয়া চিনিতেই পারিবে না। মহানবী (সঃ) কি পরচর্চা করিতেন? তাহার পোশাক কি এইরূপ ছিল? তাহার যুগে কি খেল-তামাশা, তাস, দাবা ইত্যাদি ছিল? ইচ্ছা করিলেই কি কাহারও জমি কাড়িয়া লওয়া যাইত? কাহারও টাকা মারিয়া দেওয়া যাইত? কোনও সাধারণ মানুষ সালাম করিলে আমরা অসন্তুষ্ট হই আর মহানবী (সঃ) নিজে অপরকে সালাম দিতেন। মহানবী (সঃ)-এর পুত্র বিয়োগ হইলে তিন শুধু অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন। আর আমরা তো বিলাপ করিয়া আকাশ বাতাস ফাটাইয়া ফেলি। আমাদের সবকিছুই বিগড়াইয়া গিয়াছে।

تن همه داغ داغ شد پنبه کجا کجا نہم

এই অবস্থা দেখিয়া কবি বলিয়াছেনঃ

اے بسرا پردۂ یثرب بخواب * خیز که شد مشرق ومغرب خراب

অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! আপনি নিদ্রা হইতে জাগ্রত হউন এবং দেখুন আপনার উম্মত কি বিপদে পতিত হইয়াছে।"

মহানবী (সঃ)-এর নিকট সপ্তাহে দুই দিন সমস্ত উম্মতের আমল পেশ করা হয়। চিন্তা করুন তো ইহাতে মহানবী (সঃ) কত কষ্ট পাইবেন? এক এক করিয়া প্রত্যেকের আমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি দুঃখবোধ করিবেন। তিনি আমাদিগকে এত ভালোবাসিতেন যে, আমাদের জন্য দোয়া করিতে করিতে তাহার পদযুগল ফুলিয়া যাইত। মৃত্যুর পরেও যদি আমরা তাহাকে শান্তিতে থাকিতে না দেই তাহা হইলে তাহার অবস্থা কি হইবে। আর আমরা পাপ কাজে হঠকারিতার আশ্রয় দিয়ে থাকি এবং বলিয়া থাকি যে, আল্লাহ গাফুরুর রাহিম। তিনি ক্ষমা করিয়া দিবেন। কথা হইল এই যে, আমরা যদি মহানবী (সঃ)-এর উপরে ঈমান না আনি তখনও তো আল্লাহ গাফুরুর রাহিমই বটে। তখনও কি তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন? পূর্ববর্তী যুগের সম্প্রদায়গুলি যেভাবে নবীদের

নাফরমানি করিয়াছিল তেমনিভাবে আমরা মহানবী (সঃ)-এর নাফরমানি করিতেছি। মহানবী (সঃ) বিবাহের পদ্ধতি বাতলাইয়া দিয়াছেন। আর আমরা *জিদ করিয়া উহার বিপরীত করিয়া থাকি আর ওলামা সমাজের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া থাকি। (আত তানাব্বোহ)*

সদাচরণ সততার চেয়েও জরুরী

সততার চেয়েও সদাচরণের গুরুত্ব অধিক। কারণ মানুষ সৎ হইলে তাহা হইতে অন্যের মাল নিরাপদ থাকে। আর মানুষ সদাচারী হইলে তাহার দ্বারা মুসলমানদের জানের হেফাজত হয়। আর ইহা তো জানা কথা যে, মালের চেয়ে জানের দাম বেশী। এতদ্ব্যতীত সদাচরণের দ্বারা মানুষের জানের হেফাজতের সাথে সাথে তাহার ইজ্জত আব্রুরও হেফাজত হইয়া থাকে। আর ঈমানের পরে মানুষের ইজ্জত আব্রুর হেফাজত সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু। কারণ ইজ্জতের জন্য মানুষ সবকিছুই ত্যাগ করিয়া থাকে। হক সম্বন্ধীয় হাদীসগুলিতে এই তিনটিরই হেফাজতের আদেশ রহিয়াছে। মহানবী (সঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলিয়াছেন, 'তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল এবং তোমাদের ইজ্জত একে অপরের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত হারাম করা হইল।'

বান্দার হক ও ওজিফাসমূহ

বান্দার হক আদায় করা ওজিফা ও যিকিরের চেয়েও বেশী জরুরী। বান্দার হক আদায় না করিলে তজ্জন্য কিয়ামতে ধর-পাকড় হইবে আর ওজিফা ত্যাগ করিলে কিছুই হইবে না। ওজিফা ইত্যাদি তো মুস্তাহাব আমল মাত্র। মানুষ জরুরী কাজ বাদ দিয়া কম জরুরী বিষয় নিয়া মাতিয়া থাকে। (দাওয়াতে আবদিয়াত, ২য় খণ্ড)

অপরকে কষ্ট দিও না

এই পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার কালে কেহই খালি হাতে যায় না। কিছু না কিছু আমল সাথে লইয়াই যায়– তা' তাহা যত স্বল্পই হউক না কেন, একেবারে রিক্ত হস্তে কেহ যায় না। আমি কাহাকেও তাকওয়া, পবিত্রতা, মোজাহাদা বা সাধনা শিখাইতে চাই না। কিন্তু একটি কথা অবশ্যই বলিব এবং তাহা এই যে, অপরকে কষ্ট দিও না। যদি আল্লাহর হক আদায় করিতে ক্রটি থাকিয়া যায় তবে যেহেতু তিনি ক্ষমাশীল তাই তিনি ক্ষমা করিতেও পারেন। কিন্তু আল্লাহর বান্দাদিগকে কখনও কষ্ট দিও না। কারণ ইহা গুরুতর অন্যায়। (আল ইফাজাত, পৃষ্ঠাঃ ১৯৯)

মানবতার সার কথা এবং ইনসান অর্থ কি?

ইহা যুক্তি সঙ্গত কথা যে, কোনও কিছু অনুসন্ধানের পূর্বে অনুসন্ধানীয় বস্তুটিকে চিনিতে হইবে। বুযুর্গী অন্বেষণের পূর্বে মানবতার অন্বেষণ প্রয়োজন। আর মানবতার সারকথা এই যে, তোমার নিজের দ্বারা যেন অপরের কষ্ট না হয়। (আল ইফাজাত, পৃষ্ঠাঃ ২৫৩)

মানুষ যদি সত্যিকার মানুষ হইতে পারে তাহা হইলে সে অনেক কিছুই। আর ইনসান অর্থই হইতেছে আল্লাহর সহিত সঠিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া। ইহাই সব কিছুর মূল। (আল ইফাজাত, পৃষ্ঠাঃ ৩, মলফুজঃ ৩)

অবশ্য পালনীয় আমলসমূহকে তুচ্ছ ধারণা করা অনুচিত

আমলের গুরুত্ব অনুধাবন করিবার পরেও জনসাধারণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যেও একটি ক্রটি পরিলক্ষিত হয় এবং তাহা এই যে, তাহাদের অন্তরে অ-ওয়াজেব আমলসমূহের প্রতি যতখানি গুরুত্ব রহিয়াছে ওয়াজেব আমলসমূহের প্রতি ততখানি গুরুত্ব নাই। যেমন, হুকুকুল ইবাদ ইত্যাদির চিন্তা তাহাদের নাই। আর এদিকে নফল ইবাদত ও ওজিফা ইত্যাদিকে বেশী বেশী করিয়া আদায় করিতে পারাকে তাহারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় বলিয়া মনে করে। আর যাহা আসল উদ্দেশ্য তাহাকে মানুষ তুচ্ছ জ্ঞান করে। কিন্তু ইহা জুলুম ব্যতীত আর কিছুই নহে। ওয়াজেব আমলসমূহকে তুচ্ছ জ্ঞান করার কারণ এই যে, এইগুলি সবাই পালন করিয়া থাকে। তাই মানুষ মনে করে যে, ইহা তো সবাই পালন করে। ইহার আর বৈশিষ্ট্য কি? তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে, তোমরা যাহাকে তুচ্ছ ও অপ্রয়োজনীয় মনে কর এমন সব কাজের প্রতি গুরুত্ব দিবার জন্য নবীগণ পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন? এমন বাতিল আকিদা হইতে তওবা করা কর্তব্য। ওয়াজেব আমলসমূহই আসল এবং এইগুলি সর্বত্র পালিত হওয়াই এই আমলগুলির উত্তম হওয়ার প্রমাণ বটে। (আল ইফাজাত, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬, মলফুজ ঃ ৪৩)

পরিবার পরিজনের হক সম্পর্কে উদাসীনতা প্রকৃতপক্ষে দ্বীন সম্পর্কে উদাসীনতা

মানুষ পরিবার পরিজনের হক সম্পর্কে কোন পরোয়াই করে না। তাহারা শুধু শাসন করাই বোঝে। কিন্তু ইহা চিন্তা করে না যে, আমাদের কাছেও তাহাদের কোন হক বা প্রাপ্য আছে কি-না। মানুষ তো সদাচরণকে দ্বীনের তালিকা হইতে বাদই দিয়া রাখিয়াছে। এই বিষয়ে যত ক্রটি পরিলক্ষিত হয় উহার মূল কারণ দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব। (আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়া, মলফুজঃ ৪০)

স্ত্রীর হকের গুরুত্ব

আমি ফতোয়া দিতে চাই না। কিন্তু সংসারের দায়িত্ব নিজের হাতে রাখা উচিত না স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত করা উচিত এ সম্পর্কে পরামর্শ আবশ্যই দিব। এই দায়িত্ব অন্যের হাতে থাকা উচিত নয়। তা সে ভাই হউক বা বোন হউক এমনকি পিতামাতাই হউক না কেন। কারণ ইহাতে স্ত্রীর মন ভাঙ্গিয়া যায়। স্বামী যদি সংসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলিয়া না লয় তাহা হইলে অন্যান্য আত্মীয়দের তুলনায় এই ব্যাপারে স্ত্রীর দাবী সর্বাগ্রে। শুধু ভাত কাপড় দিলেই স্ত্রীর হক আদায় হয় না বরং স্ত্রীর মনোরঞ্জন করাও স্বামীর জন্য জরুরী। ফকীহগণ এই বিষয়টিকে এতদূর গুরুত্ব দিয়াছেন যে, তাহারা স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য মিথ্যা বলাও জায়েয রাখিয়াছেন। ইহা দ্বারা বিষয়টির গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করা যায়। আর শুধু ইহাই নহে, স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য স্বয়ং আল্লাহ পর্যন্ত নিজের একটি হক মাফ করিয়া দিয়াছেন। (হুসনুল আজিজ, ৩য় খণ্ড, মলফুজ ঃ ৪৫৫)

সন্তান লালন পালনের ব্যাপারে আদব শিক্ষা দেওয়ার সীমা কি?

অনেক সময় আমরা ছোটদের উপর ভীষণ রাগিয়া যাই। আর তাহারা অসহায় বলিয়া উহার প্রতিশোধ লইতে পারে না। কোন কোন পিতামাতা এমন কসাই যে, এমনভাবে সন্তানকে মারধোর করে যে, মনে হয় যেন কোন পশুকে মারধোর করিতেছে অথবা ছাদ পিঠাইতেছে। কেহ প্রতিবাদ করিলে বলে, আমি তাহার পিতা, তাই তাহাকে মারধোর করার অধিকার আমার আছে। মনে রাখিবেন, পিতা হওয়ার অর্থ এই নহে যে, আপনি জমির মালিক হইয়া গিয়াছেন। তাহা হইলে তো মানুষ সন্তানকে বেচিয়া খাইত। পিতাকে আল্লাহ অনেক উঁচু মর্যাদা দিয়াছেন। কিন্তু তাহার অর্থ এই নহে যে, ছোটরা তাহাদের মালিকানাধীন এবং তাহাদিগকে যথেচ্ছা মারধোর করা যাইবে। বরং তাহার অর্থ এই যে, তিনি তাহাদিগকে লালন-পালন করিবেন এবং সুখে রাখিবেন। হাঁ, তাহাদিগকে সুখে রাখিতে গেলে কোন কোন সময় আদব শিক্ষা দানের জন্য শাস্তিদানের প্রয়োজন হইয়া পড়ে বৈ কি! আর শরীয়ত উহার অনুমতিও দিয়াছে। 'প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমার মধ্যেই রাখিতে হইবে'– এই নীতির ভিত্তিতে তাহাদের প্রতিপালন ও তাহাদিগকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের পরিপ্রেক্ষিতে যতটুকু কড়াকড়ি আরোপের প্রয়োজন হয় ততটুকু কড়াকড়ি আরোপ করার অনুমতি আছে। ইহার অতিরিক্ত কড়াকড়ির অনুমতি নাই। আর পিতামাতার তরফ হইতে এইরূপ কড়া শাসন শুধু গোনাহই নহে উহা মানবতা ও প্রকৃতি বিরুদ্ধও বটে। আল্লাহ তা'আলা পিতামাতাকে স্নেহ ও করুণার প্রতীক বানাইয়াছেন। তাই তাহাদের রূঢ় ব্যবহার একথাই প্রমাণ করে যে, তাহারা মানবতা বর্জিত। তাহা ছাড়া আমি ইহাও দেখিয়াছি যে, বেশী মারধোর করা শিক্ষাদানের জন্য উপকারী না হইয়া বরং ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়।

জুলুমের হাকীকত ও উহার কুফল

জুলুমে শুধু বড় লোকেরাই লিপ্ত আর ছোটরা তো এমনিতেই কোণঠাসা, *তাহারা আর অন্যের উপর জুলুম করিবে কি? এরূপ চিন্তাধারা সঠিক নয়। জুলুমে লিপ্ত থাকে সবাই।* ইহা আলাদা কথা যে, গরীবদের কাছে জুলুম করিবার উপায় উপকরণ ততটা থাকে না যতটা ধনীদের কাছে থাকে। এদিক দিয়া ধনীদের তুলনায় গরীবদের অবস্থাকে ভালই বলিতে হইবে।

কানপুর জেলায় বার আকবর নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানে এক দরিদ্র তাঁতী বাস করিত। একদিন সে অসহায় অবস্থায় বসিয়া ছিল। এমন সময় এক ধনী খান সাহেব সেখান দিয়া যাইতেছিল। তিনি ঠাট্টাচ্ছলে তাঁতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মিয়া সাহেব, কি করিতেছেন?' তাঁতীও দমিবার পাত্র নহে। সে বলিল, 'খান সাহেব, আল্লাহর শুকরিয়া আদায়া করিতেছি।' খান সাহেব বলিলেন, 'আপনার উপরে আল্লাহর এমন কি হেমেরবানী যাহার শুকরিয়া আপনি আদায় করিতেছেন?' তাঁতী বলিল, 'আমি এই জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিতেছি যে, আল্লাহ আমাকে খান সাহেব বানান নাই। কারণ তাহা হইলে আমি মানুষের উপর জুলুম করিতাম।' এবারে খান সাহেবের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। তাঁতী ঠিকই বলিয়াছিল–

ندارى بحمد الله آں دسترس

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জুলুমের উপায় উপকরণ না থাকাও আল্লাহর রহমত। কারণ জুলুমের উপায় উপকরণ যাহাদের বেশী তাহারা যত জুলুম করিবে ইহারা অতদূর করিবে না। কিন্তু এই পার্থক্য সত্ত্বেও একথা ঠিক যে, জুলুমে লিপ্ত সবাই। ধনীরা বেশী, আর গরীবেরা কম। এদিক দিয়া বলিতে গেলে গরীব হওয়াও ভালোই বটে।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহা আমাদের ধারণা অনুসারে ধনী এবং গরীবের সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করিয়া। আর যদি সাহাবাদের ধারণা অনুসারে যাচাই করা যায় তাহা হইলে তো বলিতে হইবে যে, সে যুগে কোন গরীবই ছিল না। এক ব্যক্তি জনৈক সাহাবীর নিকটে নিজের দারিদ্রের অভিযোগ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মাথা গোঁজার ঠাঁই এবং স্ত্রী আছে কি না? তিনি বলিলেন, উভয়টিই আছে। সাহাবী বলিলেন, তুমি আবার গরীব কোথায়। তুমি তো ধনী। সে বলিল, আমার একটি চাকরও আছে। সাহাবী বলিলেন, তবে তো তুমি রাজা। আমরা যেমন কোরআন হাদীস পড়ি এবং শুনি কিন্তু তাহা আমাদের মনে কোনও রেখাপাত করে না তাহাদের অবস্থা কিন্তু এইরূপ ছিল না। তাহারা যাহা কিছু শুনিতেন তাহা তাহাদের অন্তরে পাথরের নকশার মতো বদ্ধমূল হইয়া যাইত। সুতরাং এক্ষেত্রেও ঐ ব্যক্তি সাহাবীর নিকট হইতে ধনীর সংজ্ঞা শুনিয়া

পাথরের মতো নিশ্চল হইয়া গেলেন। তাহাদের নিকট মহানবী (সঃ)-এর বাণীই ছিল সর্বোত্তম সম্পদ। ইহাকেই তাহারা বিত্ত ও বৈভব মনে করিতেন।

জনৈক সাহাবী কোনও রাজনৈতিক ব্যাপারে সম্রাট হেরাক্লিয়াসের কাছে আগমন করিয়াছিলেন। সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা প্রথমে পারসিকদের কাছে যান নাই কেন? আমাদের পালা তো আরো পরে। কারণ আপনারা ও আমরা উভয়েই আহলে কিতাব। যে কাজ জরুরী তাহাই আগে করা উচিত।" এই প্রশ্ন যদি কেহ আমাদিগকে করিত তবে আমরা উত্তর দিতে গিয়া হিমশিম খাইয়া যাইতাম। কিন্তু তাহাদের সব কাজের প্রেরণাদাতা ছিল কোরআন। তাই নিঃসংকোচে সাহাবী কোরআনের এই আয়াত আবৃত্তি করিলেনঃ

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের ধারে-কাছের কাফেরদের বিরুদ্ধে *লড়াই কর। সম্রাট ইহা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। আমাদিগকেও এই চিন্তাধারা গড়িয়া তুলিতে হইবে। অর্থাৎ বর্ণিত ঘটনার আলোকে আমাদের নিজদিগকে ধনী বলিয়া মনে করিতে হইবে।*

মোটকথা, এই যুগে কেহই গরীব নাই। তাই সবাই জুলুম করিতে পারে। আমরা যাহাদিগকে গরীব বলিয়া থাকি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাহাদের দেমাগ ধনীদের চেয়েও চড়া। কোন কোন ধরনের জুলুম ইহারাই বেশী করিয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহারা ধনীদের সম্পর্কে শ্লেষাত্মক ভাষায় বলিয়া থাকে– 'আমরা তাহাদের চেয়ে খাটো কিসে?' অনেক আচার অনুষ্ঠানে দেখা যায়, ধনীরা পিছনে থাকে আর গরীবেরা মনে করে যে, আমরা কিছু না করিলে আমাদের ইজ্জত থাকে কি করিয়া? এই ইজ্জতের পাল্লায় পড়িয়া ইহারা ঋণগ্রস্ত হয় এবং কেহ বা বাড়ী বন্ধক রাখে। এই গরীবদের যা দেমাগ যদি ইহাদের ধন-সম্পদ থাকিত তবে ইহারা জুলুম করিতে ত্রুটি করিত না।

কাহাকেও মারধোর করা, কাহারও টাকা-পয়সা ছিনতাই করা নিঃসন্দেহে জুলুম। তবে জুলুম শুধু ইহাতেই সীমাবদ্ধ নহে। ছোটখাট জুলুমও জুলুমই বটে। কেহ যদি মনে করে যে, ছোট জুলুমে আর কি আসে যায়? তবে আমি বলিতে চাই যে, তাহা হইলে তোমরা ছোট স্ফুলিঙ্গ হইতে সতর্ক থাক কেন? বড় আগুন তাড়াতাড়ি সবকিছু ভস্মীভূত করিয়া ফেলে আর ছোট স্ফুলিংগে কিছুটা সময় বেশী লাগে। এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকুই। তেমনিভাবে পাপের কাজ ছোট হউক বা বড় হউক উহা সম্পর্কে বেপরোয়া ভাব দেখাইলে উহা মানুষকে ধ্বংস করিবার জন্য যথেষ্ট। আর তাহা ছাড়া ছোট বা বড় যাহাই হউক না কেন যেহেতু উহা আল্লাহর নাফরমানী তাই উহা কখনও ছোট নহে। সুতরাং ছোট বড় সর্বপ্রকারের পাপকেই বর্জন কর। কথায় বলে– جتنا چھوٹا اتنا کھوٹا অর্থাৎ 'যত

ছোট তত ঝাল।' এই কথাটি পাপের বেলায় প্রযোজ্য। কারণ বড় পাপ হইতে মানুষ তওবা করিয়া থাকে কিন্তু ছোট পাপকে তুচ্ছ মনে করিয়া মানুষ উহা হইতে তওবাও করে না। এদিক দিয়া ছোট পাপের ঝাল বেশীই বটে।

আর যেহেতু জুলুমের হাকীকত না জানার দরুন এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় তাই আমি প্রথমে জুলুমের হাকীকত বর্ণনা করিতে চাই। আমি ইতিপূর্বে যে আয়াতটি পাঠ করিয়াছিলাম তাহা এই–

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۔

অর্থাৎ "ধরপাকড় ও অভিযোগ তাহাদের বিরুদ্ধে যাহারা অন্যায়ভাবে মানুষের উপর জুলুম করে।" এই আয়াতে ظلم শব্দটিকে اَلنَّاس শব্দের সহিত সম্পর্কিত করা হইয়াছে যাহার অর্থ দাঁড়ায় মানুষের উপরে জুলুম করা অর্থাৎ অপরের হক নষ্ট করা। অভিধানে অবশ্য ظلم শব্দের অর্থ হইল وَضْعُ الشَّيْءِ فِىْ غَيْرِ مَحَلِّهِ অর্থাৎ কোন বস্তুকে অপাত্রে স্থাপন করা। যাহার একটি পর্যায় এমনও আছে যাহা পাপজনক নহে তবে অনুচিত বটে।

মোটকথা জুলুম বলিতে অনুচিত কর্ম ছগিরা ও কবিরা গোনাহ এবং কুফরকেও বুঝায়। কিন্তু এই আয়াতে ظلم শব্দটি নির্দিষ্টরূপে অপরের হক নষ্ট করাকে বুঝাইয়াছে। অপরের হক বলিতে কি বুঝায় শরীয়ত উহার ব্যাখ্যা দিয়াছে। আমি উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটির বর্ণনা দিতেছি। যেমন স্ত্রীর হক অনেক। কিন্তু অনেকেই এই [illegible] করিয়া থাকে। আর এই হকগুলি হইতেছে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তাহার ভাত কাপড় দেওয়া এবং দ্বীনের শিক্ষা দেওয়া। অনেকে তো ভাত কাপড়ই দিতে চায় না অথবা এ ব্যাপারে কড়াকড়ি করে। অনেকে ডোম বা মেথরনীর সঙ্গে ভাব রাখে। তাহাদের না আছে লোক লজ্জার ভয় আর না আছে সংসার গোল্লায় যাওয়ার চিন্তা। তাহারা সবকিছুই ভুলিয়া বসিয়া আছে আর এদিকে স্ত্রীর উপরে চালাইতেছে নিপীড়ন।

আমি জুলুম হইতে বাঁচিবার একটি পদ্ধতি বলিয়া দিতেছি যাহাকে মোরাকাবাও বলা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি অপরের উপর জুলুম করে তাহার এই চিন্তা করা উচিত যে, আমি যদি তাহার মত হইতাম এবং সে যদি আমার মত হইত তাহা হইলে আমি কি তাহার নিকট হইতে এইরূপ ব্যবহার আশা করিতাম? এই ব্যক্তি অপরের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার আশা করে অপরের সহিতও তাহার সেইরূপ ব্যবহারই করা উচিত। আর ইহাও চিন্তা করা উচিত যে, যে পদমর্যাদার কারণে আমি অন্যের উপর জুলুম করিতে প্রয়াস পাইতেছি আল্লাহ উহা আমার নিকট হইতে কাড়িয়াও লইতে পারেন এবং তিনি যে কোন নেয়ামত যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে যে কোন সময় ছিনাইয়া লইতে পারেন। ইহাতে

কাহারও টু শব্দটি করিবার জো নাই। তাহার শান তো ইহাই وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ (তুমি যাহাকে ইচ্ছা ইজ্জত দাও এবং যাহাকে ইচ্ছা লজ্জিত কর।)

মানুষ আজকাল সংবাদপত্র এবং ইতিহাস ইত্যাদি পড়ে ঠিকই কিন্তু তাহা সময় কাটানোর জন্য, উপদেশ গ্রহণের জন্য নহে। অবস্থার পরিবর্তন হইতে সময় লাগে না। তাই মানুষের একথা চিন্তা করা উচিত যে, আমি যাহার উপর আজ জুলুম করিতেছি আল্লাহ ইচ্ছা করিলে আমাকেও তাহার মত লাঞ্ছিত করিতে পারেন।

আমাদের চোখের সামনে এমন অনেক বাস্তব ঘটনা অহরহ ঘটিতেছে। তাই এরূপ চিন্তা করিতে বাধা কোথায়? আচ্ছা ইহাও বাদ দিলাম। আপনি ইহাই চিন্তা করুন যে, আল্লাহর সামনে তো সবাই ক্ষুদ্র এবং আমি এই (মজলুম) ব্যক্তির উপর (জুলুম করিতে) যতখানি ক্ষমতা রাখি আল্লাহ তায়ালা আমার উপর উহার চেয়েও বেশী ক্ষমতাবান এবং এই ব্যক্তি আমার নিকট যতদূর অপরাধী আমি তো আল্লাহর নিকট উহার চেয়েও বেশী অপরাধী। আল্লাহ তায়ালা আমার এত অপরাধ এবং তাহার (শাস্তি দানের) অসীম ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যখন আমাকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দিতেছেন না বরং এড়াইয়া যাইতেছেন তখন আমার কর্তব্যও তো ইহাই হওয়া উচিত যে, আমিও ঐ ব্যক্তির উপর জুলুম না করি। বরং সবচেয়ে ভালো হয় যদি আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেই। হয়তো ইহার বরকতে আল্লাহ আমাকেও ক্ষমা করিয়া দিবেন।

নিজের স্ত্রীর মন যোগাইয়া চলিও এবং তাহার সহিত হাসি খুশী ভাব রাখিও এবং কোন ভাবেই তাহার উপর জুলুম করিও না। আল্লাহকে ভয় করিও। কারণ আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তোমাকে কোন বিপদে নিপতিত করিতে পারেন বা কোন মামলায় ফেলিয়া দিতে পারেন বা কোন কঠিন অসুখও দিতে পারেন অথবা কোন অত্যাচারী শাসককে তোমার উপর প্রবল করিয়াও দিতে পারেন। জুলুমের শাস্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুনিয়াতেই হইয়া থাকে। পূর্ববর্তী যুগে তো চোখের সামনেই আযাব আসিয়া যাইত। ইহা আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী যে, এই উম্মতের উপর তিনি সরাসরি আযাব পাঠান না। কারণ ইহাতে লাঞ্ছিত হইতে হয়। তবে লোক চক্ষুর অন্তরালে পাপীর শাস্তি ঠিকই হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা যে তাহার পাপের শাস্তি বস্তুবাদীরা তাহাও মানিতে চায় না। তাহারা ইহার বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা তাহার জুলুমের শাস্তিই বটে। বিশেষতঃ যখন মজলুম ব্যক্তি তাহার জন্য বদদোয়া করে। কারণ মজলুমের বদদোয়া দ্রুত কবূল হইয়া থাকে। এমনকি মজলুম ব্যক্তি কাফের হইলেও তাহার দোয়া আল্লাহ কবূল করিয়া থাকেন।

স্ত্রীর উপর আরও এক ধরনের নির্যাতন হইয়া থাকে এবং ইহাতে অনেক তথাকথিত ধার্মিকরাও জড়িত। তাহা এই যে, স্বামী যাহা কিছু আয় করে তাহার

সবটাই পিতামাতার হাতে তুলিয়া দেয় আর স্ত্রীকে তাহাদের হাতের ক্রীড়নক বানাইয়া রাখে। অনেক পিতামাতাও এমন আছে যে, পুত্রবধুর খোঁজ খবর লয় না এবং সে আলাদা হইয়া যাইতে চাইলে সে সুযোগও তাহাকে দেয় না। আর বলে যে, ইহাতে ঘরের কথা বাহিরে চলিয়া যাইবে। আগের জামানার অধিকাংশ বুড়ীদের চিন্তাধারাই এইরূপ ছিল। জানিয়া রাখিও, আল্লাহর নাফরমানি করিয়া কাহারও আনুগত্য করা যাইতে পারে না। যদি স্ত্রী আলাদা হইয়া থাকিতে চায় তবে সে অধিকার তাহার আছে। আর আধুনিক যুগে তো আলাদা হইয়া বাস করাই সমীচীন। একত্রে বাস করার ঝামেলা অনেক। অধিকাংশ বুড়ী বউদের অনেক জ্বালাতন করে। আর যদি ছেলে বউয়ের প্রতি অনুরাগী হয় তবে এই বুড়ীরা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। আর ছেলে যদি বউয়ের প্রতি অনুরাগী না হয় তখন ইহারাই আবার ছেলেকে নুন পড়া খাওয়ায় এবং তাবিজও করায়। আলাদা হইয়া বাস করিলে এই সব ঝামেলা হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

যদি কেহ বলে যে, আজকাল বউরাও তো কম যায় না। তাহারা শ্বাশুড়ীকে মানিতে চায় না, ঝগড়া বাঁধায় ও মুখের উপর কথা বলে। তাহা হইলে আমি বলিব, এক্ষেত্রে তো তাহাদিগকে আলাদা করিয়া দেওয়াই সমীচীন। আলাদা থাকিলে উভয় পক্ষেরই লাভ।

এতক্ষণ তো স্ত্রীর হকের কথা বলিলাম। অনেকে পিতামাতার হক ঠিকমত আদায় করে না এবং স্ত্রীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে।

ইহার সমাধানও আমি আগেই বলিয়াছি। অর্থাৎ আলাদা হইয়া বাস করিলে পক্ষপাতিত্বের আর সুযোগই থাকিবে না।

আর এক ধরনের নির্যাতন আছে যাহাতে বেশীর ভাগ ধনী ও জমিদারগণ জড়িত। ইহারা কুলি, মজুর ও গাড়োয়ান ইত্যাদি শ্রমিকদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করিয়া কাজের শেষে তাহাদিগকে কিছু টাকা দিয়া বলে, 'যাও, ইহার বেশী পাইবে না।' ইহা জুলুম ছাড়া আর কিছুই নহে। সারকথা এই যে, জমিদারীর অনেক দরজা দোযখের দরজা বটে। এদিকে দরজা বন্ধ হইলে দোযকের খোলা দরজা নজরে পড়িবে। আর সেখানে কোন সাহায্যকারী নাই এবং কোন উকিল বা ব্যারিস্টার নাই। আর সরকারের কাছেই যখন প্রজার কোন জোর খাটে না তখন আল্লাহর সামনে আর কাহার জোর খাটিবে? সেদিন আসিবে এবং খুব সত্বরই আসিবে।

অনেক ধনী ও জমিদার শ্রমিক ও কর্মচারীদের দ্বারা এমন কাজ করান যাহা করা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। ইহাও জুলুমই বটে। মানুষের নিজের বেলায় ইহা চিন্তা করা উচিত যে, এই কাজ আমি করিতে গেলে তাহা কত কঠিন হইত। সোজা কথায়, এমন কোনও কাজ করা উচিত নহে যাহাতে অন্যের কষ্ট হয়।

আমি আদাবুল মোয়াশারাত নামে একটি কিতাব লিখিয়াছি। উহাতে সমাজে যত প্রকারের হক হইতে পারে তাহার সবই উল্লেখ করিয়াছি। নির্যাতনের যত পদ্ধতি আছে তাহার সবকিছুরই উদ্ভব ভালোবাসার অভাব হইতে। আমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির বড় অভাব। আমাদের উচিত পারস্পরিক সম্প্রীতি গড়িয়া তোলা। কাহারও সহিত হৃদ্যতা না জন্মিলে তাহার উপকার করা উচিত। তাহা হইলে সে তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইবে এবং তুমিও তাহার প্রতি অনুরাগী হইবে। আমাদের ইহা লক্ষ্য রাখা কর্তব্য যে, কাহারও দ্বারা যেন অপর কাহারও ক্ষতি বা কষ্ট না হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে আমরা যেন এই হাদীসের উপর আমল করি– 'মুসলমান ঐ ব্যক্তি যাহার হাত ও মুখ হইতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।' আমরা যদি এভাবে জীবন যাপন করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের মৃত্যুর পরেও মানুষ আমাদিগকে অশ্রুসিক্ত নয়নে স্মরণ করিবে। কবি কি সুন্দর বলিয়াছেন ঃ

یاد داری که وقت زادن تو * همه خنواں بدند تو گریاں

آنچناں زی که وقت مردن تو * همه گریاں بدند تو خنداں

অর্থাৎ "যখন তুমি এসেছিলে ভবে কেঁদেছিলে তুমি হেসেছিল সবে

এমন জীবন তুমি করিবে গঠন মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভূবন।" (আজ জুলুম, পৃষ্ঠাঃ ১২-১৪)

অনুমতি গ্রহণ

শরীয়তে অন্যকে অসুবিধায় ফেলিতে নিষেধ করা হইয়াছে। এই জন্য শরীয়তে অন্যের ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণের বিধান রহিয়াছে। কারণ বিনা অনুমতিতে অন্যের ঘরে প্রবেশ করিলে সে অস্বস্তি বোধ করে। অনুমতি গ্রহণের পদ্ধতি এই– প্রথমে ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া সালাম করিবে। অতঃপর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাহিবে। এই অনুমতি আরবী ভাষায় চাওয়া যায়, উর্দূ ভাষাতেও চাওয়া যায়, দিল্লীর ভাষাতেও চাওয়া যায় এবং লাখনৌর ভাষাতেও চাওয়া যায়। কিন্তু সালামের শব্দাবলী শরীয়তের বিরুদ্ধে হইলে চলিবে না। যেমন অনেক স্থানে আদব বা তাসলিমাতের রেওয়াজ আছে। এ সম্পর্কে এক ব্যক্তি একটি গল্প বলিয়াছিল এবং উহা এই–

সে এক মজলিসে যাইয়া বলিল, আমার সেজদাও কবূল হউক। উপস্থিত লোকেরা প্রশ্ন করিল, ইহা আবার কি? সে বলিল, আমি দেখিলাম প্রত্যেক আগন্তুক ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় সালাম করিতেছে। কেহ বলিতেছে আদাব কবূল হউক। কেহ বলিতেছে বন্দেগীর কথা কেহ বা বলিতেছে কুর্নিশের কথা ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ এই জাতীয় সব শব্দই শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি ভাবিলাম আমি

আর কি বলিতে পারি? আমার বলার জন্য সেজদা ছাড়া আর কোন শব্দই ছিল না, সুতরাং আমি উহাই বলিলাম। সে যাহাই হউক সালাম দিতে গিয়া শরীয়ত বিরুদ্ধ কোন শব্দাবলী বলা যাইবে না। তবে অনুমতি গ্রহণের ক্ষেত্রে যে কোন শব্দ বলা যাইতে পারে। তবে এমন কথাই বলা উচিত যাহাতে অন্যেরা বুঝিতে পারে যে, তুমি অনুমতি চাহিতেছ। (আল এরতেবাত)

সময়ানুবর্তিতা ইসলামের শিক্ষা

সময়ানুবর্তিতা ইসলামের শিক্ষা। মহানবী (সঃ)-এর সময়ানুবর্তিতা সম্পর্কে শামায়েলে তিরমিযীতে উল্লেখ আছে যে, মহানবী (সঃ) ঘরে থাকাকালে সময়কে তিন অংশে ভাগ করিয়া লইতেন। একাংশ আল্লাহর এবাদতের জন্য, একাংশ পরিবার পরিজনদের জন্য, একাংশ সাহাবীদের জন্য। ঐ সময় বিশিষ্ট সাহাবীগণ আসিয়া মহানবী (সঃ)-কে তাহাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা জানাইতেন। তাহারা কাহারও জন্য মহানবী (সঃ)-এর কাছে সুপারিশ করিতেন, কাহারও বা অভাব অভিযোগের কথা মহানবী (সঃ)-কে অবহিত করিতেন ইত্যাদি। আজকালকার মুসলমানরা এ সম্পর্কেও এত অজ্ঞ যে, সময়ানুবর্তিতা যে ইসলামের শিক্ষা তাহাও তাহারা জানে না। (শোয়াবুল ঈমান, পৃষ্ঠাঃ ১১)

সময়ানুবর্তিতা অনেক বড় জিনিস। এক কাজের সময় অন্য কাজ করা অনুচিত। যে কাজের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে ঐ কাজ ঐ সময়ে করিবে। ইহাতে সময়েও বরকত পাওয়া যায় এবং কাজ করিয়াও শান্তি পাওয়া যায়। (হুসনুল আজিজ, ২য় খণ্ড, ৪৩৪ মলফুজ)

আজকের কাজ যে ব্যক্তি আগামীকালের জন্য ফেলিয়া রাখে সে কাজ করিয়া কখনও শান্তি পায় না। কারণ আগামীকালের জন্যও তো নির্দিষ্ট কাজ রহিয়াছে। তাই আগামীকাল একই দিনে দুইদিনের কাজ হইতে পারে না। (দাওয়াউল উয়ুব পৃষ্ঠাঃ ১৯)

শরীয়ত সব বিষয়ে শৃংখলা শিক্ষা দিয়াছে

শুধু দ্বীনি ব্যাপারেই নহে, পার্থিব বিষয়েও শরীয়ত শৃংখলা শিক্ষা দিয়াছে। তাই দেখা যায়, কোরআনে আল্লাহ হযরত দাউদ (আঃ)-কে বর্ম নির্মাণ শিক্ষাদান প্রসঙ্গে বলিতেছেন– وقـدر فى الـسـرد অর্থাৎ বর্মের কড়াগুলো সঠিক মাপে বানাইও। এখানে লক্ষণীয় যে, বর্মের কড়াগুলো সঠিক মাপে না বানাইলেও উহা দ্বারা আত্মরক্ষায় কোনও ত্রুটি হয় না। তথাপি আল্লাহ উহাকে সঠিক মাপে নির্মাণ করিতে বলিয়াছেন। (মলফুজাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৫৮)

যে কোন বিষয়েই হউক না কেন কাহাকেও ছাত্র বানাইলে তাহাকে নীতি ও পদ্ধতিগত ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে। তাহা কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় হউক

অথবা কোন শিল্প হউক, এমনকি রুটি প্রস্তুত প্রণালীই হউক না কেন। যদি বেঢপ পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করা হয় তাহা হইলে বিষয়ের বদনাম হয়। (মলফুজাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৮৪)

মানুষের মনে সুরুচির প্রভাব পড়ে। কুরুচিতে অন্তর নোংরা হইয়া যায়। আর আজকাল মানুষের মধ্যে সুরুচির চেতনা নাই বলিলেই চলে। এমনকি মানুষকে ইহা বুঝাইলেও বুঝিতে চায় না। মানুষ নিজে সংশোধন হইতে না চাহিলে অপরে তাহাকে সংশোধন করিতে পারে না। (মলফুজাত, ৫ম খণ্ড, পষ্ঠাঃ ৩)

অন্যের অধীনস্থ ব্যক্তির উপর আমি প্রভাব খাটাই না। সে যাহার অধীন আমি তাহার নিকট হইতে অনুমতি লইয়া লই। যদিও সেই অনুমতিদাতা আমার অধীনস্থ কেহ হউক না কেন। ইহাতে কাজে বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে না। (মলফুজাত, ২য় খণ্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা)

রুচি জ্ঞানের অভাবের কারণ বেপরোয়াভাব

পৃথিবী হইতে রুচিবোধ লোপ পাইয়াছে। উহা না আছে আরবীয় পরিবারে আর না আছে ইংরেজ পরিবারে। আজকাল সর্বত্র বেপরোয়া ভাবেরই ছড়াছড়ি। উহারই বদৌলতে সুরুচি জ্ঞান লোপ পাইয়াছে। আমার দ্বারা অপর কাহারও যেন কষ্ট না হয়– মানুষ এতটুকু চিন্তা করিতেও নারাজ। (মলফুজাত, ৫ম খণ্ড পৃষ্ঠাঃ ২৮)

বেহিসাবী ও অপরিণামদর্শিতার ফল

মাওলানা থানবী এক মৌলবী সাহেবের প্রশ্নের জবাবে বলেন, আপনি যে ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন প্রকৃত প্রস্তাবে শৃংখলা এমনই জিনিস। শৃংখলা আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত এবং বরকতের জিনিস। শৃংখলা না থাকিলে রাজ্য টেকে না। উপমহাদেশে বহুকাল যাবত মুসলমানরা রাজত্ব করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের পতন হইয়াছে বিশৃংখলা ও অপরিণামদর্শিতার কারণে। অনুরূপভাবে যে ঘরে বিশৃংখলা বিরাজ করে সে ঘরে বরকত থাকে না। আধুনিক যুগেও মুসলমানদের ধ্বংসের কারণ হইতেছে দুইটি– বেহিসাবী হওয়া ও অপরিণামদর্শিতা।

বেহিসাবী ও অপরিণামদর্শিতা অর্থ কি?

বেহিসাবী অর্থ হইল আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা না করা। হিসাব না করিয়া খরচ করা। আর অপরিণামদর্শিতা অর্থ পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তা না করা।

নীতি ও নিয়মের বরকতসমূহ

একটা পদ্ধতির ভিতর দিয়া চলিলে সব কাজ সহজ হইয়া যায় এবং কোন অসুবিধা দেখা দেয় না। নীতি ও নিয়মের প্রয়োজনীয়তা এবং বরকত এখানেই। অপরিণামদর্শিতা হইতে যত বিশৃংখলার উৎপত্তি। আমি মানুষকে পরিণাম সম্বন্ধে

চিন্তা করিতে বলি। কিন্তু মানুষ ইহাতে ঘাবড়াইয়া যায়। কিন্তু কাজ হইবে তো কাজের পদ্ধতিতেই। এখন মানুষের অবস্থা তো এই যে, নিজেও কিছু করিবে না এবং অপরকেও কিছু করিতে দিবে না। কেহ কিছু করিলে উহার সমালোচনায় লাগিয়া যাইবে। (মলফুজাত, ৩য় খণ্ড ,পৃষ্ঠঃ ১৮৬)

আমি আমার সব বন্ধুদিগকে নীতির পাবন্দ দেখিতে চাই। তাহাদিগকে নীতির অনুসারী দেখিতে পাইলে তাহাদের ছোটখাট ত্রুটি আমি ক্ষমা করিয়া দেই। কাহাকেও অপরিণামদর্শী দেখিলে তখন আমার অস্বস্তি লাগে। (আল ইফাজাত, মলফুজ, ৫৯৫)

চিঠিপত্রের জওয়াব আমি সঙ্গে সঙ্গেই দিয়া দেই। ইহাতে উভয় পক্ষেরই লাভ। আমিও উত্তর দিয়া খালাস, আর সেও সময় মতো উত্তর পাইয়া খুশী। তাহা ছাড়া আমার কাছে অনেক দূর-দূরান্ত হইতে চিঠিপত্র আসে যাহাতে মানুষের নানাবিধ প্রয়োজনের উল্লেখ থাকে। তাই আমি প্রতিদিনের চিঠিপত্রের জওয়াব সেদিনই শেষ করিয়া দেই। আমি এদিকে এই জন্য খেয়াল রাখি যেন অন্যের কষ্ট না হয়, আর উত্তরের অপেক্ষায় কাহাকেও থাকিতে না হয়। (মলফুজাত, প্রথম খণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা)

পাপীকে তুচ্ছ মনে করা ও তাহাকে লাঞ্ছিত করা অহংকার বটে

এক ব্যক্তি চিঠিতে লিখিয়াছে যে, জনৈক নারী বেপর্দায় চলে এবং মুচি মেথরদের সামনেও যায়। তাহার স্বামীও ঐ রূপ। এই নারীর হাতের রান্না খাওয়া কিরূপ? আমি তাহাকে লিখিয়াছি যে, কাফেরের হাতের রান্না খাওয়াও জায়েয আর এই নারী তো মুসলমান। তিনি লিখিয়াছেন যে, এ ব্যাপারে ফতোয়া কি এবং তাকওয়ার দৃষ্টিতেই বা হুকুম কি? আমি লিখিয়াছি, 'কোনও মুত্তাকী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন।'

অতঃপর হযরত মাওলানা বলেন, মনে হয় এই ফতোয়া প্রার্থীরা কোন পাপের কাজ করেই না। একেবারে হাল জামানার জোনায়েদ বাগদাদী আর কি! ফতোয়া হাসিল করিয়া অপর মুসলমানকে লাঞ্ছিত করা বা তাহাকে লাঞ্ছিত মনে করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। আমার উত্তরে আমি ইহার কোনও সুযোগই রাখি না। আর এ জন্যই মানুষ আমার উত্তরে খুশী হয় না বরং আফসোস করে যে, খামাখা ইনভেলাপের পয়সাটাই গেল। এই অহংকারীদের অভ্যাস তো এই যে, অন্যের শরীরে মাছি পড়িতে দেখিলেও ইহাদের আপত্তি আর এদিকে নিজেদের শরীরে যে পোক জন্মিয়াছে তাহার খোঁজ নাই। আমার কাছে আসিলে এই সব অহংকারীর মাথা ধোলাই হইয়া যায়। (আল ইফাজাত, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ২২৩)

চাঁদাদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অর্থহীন

আজকাল ইহা রেওয়াজে পরিণত হইয়াছে যে, কেহ কোন নেক কাজে চাঁদা দিলে মানুষ দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ইহার কোনও অর্থ হয় না। বরং আমাদের কর্তব্য তাহার জন্য দোয়া করা। কেহ ব্যক্তিগতভাবে কাহাকেও কিছু দান করিলে শুধুমাত্র তখনই দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যাইতে পারে। ইউরোপবাসীরা চাঁদাদাতার প্রতি মজলিসেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাদের দেখাদেখি আমাদের মধ্যেও এই অভ্যাস গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা তাহাদের অনুকরণ মাত্র।

বক্তৃতা শুনিয়া হাত তালি দেওয়া আমাদের সংস্কৃতি নহে

আমরা তো সব কাজ পশ্চিমাদের স্টাইলে করিতে চাই। তাই কাহারও বক্তৃতার কোন অংশ মনঃপূত হইলে আমরা হাত তালি দিতে থাকি। অথচ তালি দেওয়া হয় তো অপমানের ক্ষেত্রে। ইহা তো সংস্কৃতি নহে, দুর্গতি। এক্ষেত্রে আমাদের সংস্কৃতি হইল সুবহানাল্লাহ বলা। বরং সবচেয়ে উত্তম হইল কিছুই না বলা। কারণ নিশ্চুপ থাকিলে চোখে মুখে যে খুশীর ভাব ফুটিয়া ওঠে মুখে প্রকাশ করিলে তাহা হয় না। বিশেষতঃ যখন মুখের প্রকাশও হয় কৃত্রিম। যেমন আজকাল দেখা যায় যে, মুখে তো খুশী প্রকাশ করিতেছে আর অন্তরে উহার কিছুই নাই। এই প্রকাশের কি অর্থ হয়? অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভক্তি হইল বড় জিনিস, তাহা মুখে প্রকাশ পাক আর নাই পাক। বক্তাকে খুশী করার জন্য তাহার বক্তৃতার প্রতি শ্রোতাদের মনোযোগ প্রদানই যথেষ্ট। মৌখিক প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ সেই প্রশংসা যদি অমুসলিমদের পদ্ধতিতে হয়। যেমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি পদ্ধতি আমরা রপ্ত করিয়া লইয়াছি। যাহা পাশ্চাত্যের অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নহে। এক্ষেত্রে দোয়া করাই হইতেছে সুন্নাত। (আশরাফুল মাওয়ায়েয, পৃষ্ঠা ঃ ৬৪)

খাদ্যের কদর করা উচিত

খাদ্য ও পানীয় আল্লাহর নেয়ামত। উহার কদর করা উচিত। অনেকে আকণ্ঠ ভোজন করিয়া থাকে। ইহা বদভ্যাস। মহানবী (সঃ) খাওয়া শেষ করিয়া اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا-এর সঙ্গে ইহাও বলিতেন, غَيْرُ مُوَدَّعٍ وَلَا مَكْفُوْرٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عِنْدَ رَبِّنَا অর্থাৎ হে প্রভু! আমি খাদ্যকে বিদায় দিতেছি না। ইহার অমর্যাদাও করিতেছি না এবং আমি ইহা হইতে অভাব মুক্তও নহি (বরং অন্য সময়ে ইহা আমার প্রয়োজন হইবে)।

ভণ্ড দরবেশ

আজকাল দরবেশরা মুরিদদের সামনে গলাবাজী করিয়া বলিয়া থাকে যে, আমি জান্নাতের পরোয়া করি না, দোযখেরও পরোয়া করি না। আরে মিয়া, তুমি তো রুটিরও মুখাপেক্ষী। দুই দিন খাবার না জুটিলে তোমার সব দরবেশগিরি গোল্লায় যাইবে। কথা শিখিয়াছ তাই মুখে যাহা আসে তাহাই বলিতে থাক।

এক দরবেশ কানপুরে আমার কাছে আসিল এবং দশটি টাকা চাহিল। ইহার পর সে তাসাওওফের আলোচনা শুরু করিল এবং বলিতে লাগিল, আমি জান্নাতের পরোয়া করি না, দোযখেরও না। আমি বলিলাম, শাহ সাহেব, একটু হুশ করিয়া কথা বলো। তুমি জান্নাত দেখ নাই। দেখিলে এমন বেপরোয়া ভাব প্রকাশ করিতে না। দশটা টাকা না হইলে তোমার চলে না। জান্নাত দেখিলে নিশ্চয়ই তুমি ধৈর্যধারণ করিতে। (আল আশর)

কর্জ দিলে উহা লিখিয়া লও

কর্জ সম্পর্কিত আয়াতের চেয়ে বেশী রহমতের আয়াত আর নাই। ঐ আয়াতে আল্লাহ মালের হেফাজতের পদ্ধতি শিখাইয়া দিয়াছেন এবং তাহা এই, তোমরা কাহাকেও কর্জ দিলে উহা লিখিয়া রাখিও এবং এ বিষয়ে দুই জনকে সাক্ষী রাখিও। ইহাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের ক্ষতি হউক তাহা দেখিতে চান না।

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি এজমালী সম্পত্তি

শরীয়তের বিধান এই যে, মৃত ব্যক্তির সমগ্র সম্পদ ওয়ারিশদের জন্য এজমালী সম্পত্তি। আর এজমালী সম্পত্তি অন্য শরীকদের অনুমতি ব্যতীত ব্যয় করা যাইতে পারে না। সুতরাং পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের পূর্বে সমস্ত ওয়ারিশদের অনুমতি ব্যতীত একটি জামা, পাজামা, এমনকি টুপি, কোমরবন্দ, রুমাল বা সূঁচ পর্যন্ত কাহাকেও দান করা জায়েয নাই।

পোশাক সম্পর্কে অহেতুক বাড়াবাড়ি

আমার এখানে একজন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি আসিয়াছিলেন এবং কয়েকদিন থাকিয়া পরে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কয়েকবার পোশাক পরিবর্তন করিতেন। দেশে ফিরিবার পরে তিনি আমাকে কোন এক বিষয়ে চিঠি লিখিয়াছিলেন। আমি উহার উত্তর দিয়াছিলাম এবং ইহাও লিখিয়াছিলাম যে, আপনি এখানে অবস্থানকালে এই শ্লোকের প্রতীক ছিলেনঃ

گہے در کسوت لیلی فروشد * گہے در صورت مجنوں برآمد

অতঃপর তিনি উত্তরে জানাইয়াছিলেন যে, বাস্তবিকই আমার আচরণ আপত্তিকর ছিল। বর্তমানে আমি উক্ত আচরণ হইতে তওবা করিয়াছি। (২৬ মোহররম, ১৩৫১হিজরী)

সুবেশ পাপের কারণও হইতে পারে

হযরত মাওলানা থানবী জনৈক মৌলবী সাহেবকে বলেন, এগুলো অভিজ্ঞতার কথা। জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন, উত্তম পোশাক পরিধান করিলে মনে এই চিন্তা অবশ্যই জাগে যে, কোন সুন্দরী নারী বা অনুরূপ কেহ আমাকে দেখুন। এক্ষেত্রে এই সুন্দর পোশাক প্রবৃত্তি পূজারীদের জন্য পাপের কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। (আল ইফাজাত, ২য় খণ্ড, ৩২ঃ পৃষ্ঠা)

মর্যাদা হয় গুণের দরুন, পোশাকের দরুন নহে

কবি আলী হাজিনের নিকট এক ব্যক্তি আসিল। তাহার পোশাক খুব জাঁক-জমকপূর্ণ ছিল। আলী হাজিন মনে করিলেন, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোন শিক্ষিত ও ভদ্রলোক হইবে। লোকটি পা ছড়াইয়া বসিল। আলী হাজিন তাহার খাতিরে পা গুটাইয়া বসিলেন। কথাবার্তা শুরু হইল। আলী হাজিন তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল ইসোফ (প্রকৃত শব্দ হইবে ইউসুফ)। আলী হাজিন এবারে পা মেলিয়া বসিলেন এবং বলিলেন بابا اگر تو یوسف هستی من پائے خودرا چرا کشم অর্থাৎ তুমি যদি ইসোফ হও তবে আর আমি পা গুটাইতে যাই কেন? তিনি একটি শব্দ দ্বারাই বুঝিয়া লইলেন যে, আগন্তুক এক মূর্খ ছাড়া আর কিছুই নহে এবং তখনই তিনি তাহাকে সম্মান দেখানো ত্যাগ করিলেন। কারণ সম্মান হয় গুণে, পোশাকে নহে। পোশাকের দরুন দুনিয়াদার ব্যক্তিদের যে সম্মান দেখানো হয় উহা শুধু ভয়ের কারণে, মহত্ত্বের কারণে নহে। যেমন সাপকে দেখিয়া মানুষ দাঁড়াইয়া যায় ইহাও তেমনি। পোশাক, চাল-চলন বা কথাবার্তার চমক দ্বারা মর্যাদার আশা করা মানুষের কাজ নহে। পোশাকের দ্বারা কাহারও মর্যাদা নির্ণয় করা বাঞ্ছণীয় নহে। (আর রাহিল, পৃষ্ঠা ঃ ১০)

সাদাসিদা চালচলন

সাদাসিদা চালচনের মধ্যে স্বাদ আছে। সবাই সহজ ও সরলভাবে চলিতে চায়। কিন্তু গর্বের দরুন ও লাঞ্ছনার ভয়ে পারিয়া ওঠে না। (হুসনুল আজিজ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৩৭১)

কেতাদুরস্ত হইতে গিয়া বাড়াবাড়ি করা অহংকার বটে

কেতাদুরুস্ত হওয়া, ঠাঁটবাট দেখানো এগুলি শয়তানী ফাঁদ মাত্র। মানুষ নিজেকে এমন বড় কেন মনে করিবে যদ্দরুন ঠাঁটবাটের প্রয়োজন হয়? আল্লাহ মানুষকে যে পোশাকে এবং যে অবস্থায় রাখেন উহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং তাহার সামনে নিজের মত ও ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দেওয়া উচিত। (আনফাসে ইসা, পৃষ্ঠাঃ ১৫৩)

সাদাসিদা চাল-চলন মানুষকে মহৎ করে

রাজা-বাদশাহগণ সাদাসিদা পোশাক পরিতেন এবং ইহা তাহাদের গুণ বলিয়া স্বীকৃত। ঐতিহাসিকরা কোথাও বলেন নাই যে, অমুক রাজা একশত টাকা গজের পোশাক পরিতেন। সহজ সরল জীবন মহত্ত্বের প্রতীক। আমি কাহাকেও সাজগোজ করিতে দেখিলে তাহাকে নীচুমনা বলিয়া মনে করি। (উঁচুমনা হইলে সে সাজগোজের সময় পাইবে কখন?) হযরত ওমরের (রাঃ) যুগে সম্রাট হেরাক্লিয়াসের দূত মদীনায় আসিয়া মদীনাবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তোমাদের খলিফার প্রাসাদ কোনটি? তাহাদের শান-শকওত ছিল জাঁক-জমক ছাড়াই।

هیبتِ حق است ایں از خلق نیست * هیبت ایں مرد صاحب دلق نیست

(আল ইফাজাত)

স্বামীর মাল ব্যয় করা

অনেক মেয়েলোক স্বামীর অগোচরে সংসারের খরচ হইতে টাকা বাঁচাইয়া উহা নানা ছল-ছুতায় নিজের পিতামাতাকে দিয়া থাকে। ইহা শক্ত গোনাহ। শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বামীর মালে স্ত্রীর আত্মীয়দের কোন অধিকার নাই। তাহাদিগকে কিছু দিতে হইলে স্বামীর অনুমতি লইতে হইবে। স্বামী স্ত্রীকে কোন মালের মালিকা বানাইয়া দিলে উহা ব্যয় করিতে স্বামীর অনুমতি লাগিবে না। আর স্বামী স্ত্রীকে সংসারের খরচের জন্য বা জমা রাখিবার জন্য কোন টাকা দিলে স্ত্রী উহা স্বামীর বিনা অনুমতিতে ব্যয় করিতে পারিবে না। এমনকি উহা ভিক্ষুককে দেওয়াও বৈধ নহে।

কথা ও কাজের ভালো ও মন্দ

সব কাজেরই কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে। সুতরাং প্রত্যেক কথা ও কাজের পূর্বে উহার উদ্দেশ্য ভাবিয়া দেখা দরকার। উদ্দেশ্য বিহীন কথা ও কাজ অনর্থকরূপে গণ্য। আর উদ্দেশ্য কল্যাণকর না হইলে উহাও অনর্থক বটে। উদ্দেশ্য অকল্যাণকর হইলে উক্ত কথা ও কাজ ক্ষতিকর। এই নীতির ভিত্তিতে আপনি নিজের কথা ও কাজের ভালো ও মন্দ, উহার উপকারী ও অপকারী হওয়া বুঝিয়া লউন। (জামালুল জলিল, পৃষ্ঠাঃ ২৫)

প্রত্যেক কাজ করিবার পূর্বে চিন্তা করুন যে, উহা দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য অকল্যাণকর কি না? তাহা হইলে সহজেই উহা সংশোধন হইয়া যাইবে। (কামালাতে আশরাফিয়া, পৃষ্ঠা ঃ ৩০৫)

আদবের সংজ্ঞা

আজকাল লোকে সম্মানকে আদব বলে। অথচ আদব হইতেছে শান্তির ব্যবস্থার নাম। যে কাজে অন্যের কষ্ট হয় উহা আদব নহে। হযরত মাওলানা

ইয়াকূব (রহঃ) বলিতেন, আমার তাজিমের জন্য তোমরা বসা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইও না। এক্ষেত্রে না উঠাই ছিল আদব। (আল ইফাজাত, মালফুজঃ ১৬)

ছোট ও বড়র মধ্যে সম্প্রীতি নাই কেন?

ছোটরা যদি নিজদিগকে ছোট মনে করে এবং বড়রা যদি মনে করে যে, উহারা ছোট নহে তাহা হইলে কেমন মজা হয়। এরূপ হইলে সমাজে শান্তি আসিবে।

আজকাল ছোটরা নিজদিগকে ছোট মনে করে না এবং বড়রা উহাদিগকে ছোট মনে করে। আর ইহারই কারণে পারস্পরিক সম্প্রীতি গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। (আল ইফাজাত)

নিজেকে অন্য বংশের বলিয়া পরিচয় প্রদান

হাদীসে আছে, নিজেকে নিজের বংশের স্থলে অন্য বংশের বলিয়া পরিচয়দানকারী জান্নাতের সুঘ্রাণও পাইবে না। আর আজকাল জোলাও শহরে গিয়া সৈয়দ বনিয়া বসে। যেমন কাবুল হইতে এক জোলা ভারতে আসিয়া পাঠান সাজিল। কিছুদিন পরে আসিল এক পাঠান। সে যখন দেখিল যে, জোলা পাঠান হইয়া গিয়াছে তখন সে সৈয়দ সাজিল। কিছুদিন পরে আসিল এক সৈয়দ। সে যখন দেখিল যে, পাঠান সৈয়দ বনিয়া গিয়াছে তখন সে নিজেকে খোদার পুত্র বলিয়া দাবী করিয়া বসিল। মানুষ ইহাতে হাসাহাসি শুরু করিল। ইহাতে সে বলিল, যে দেশে জোলা আসিয়া পাঠান সাজে আর পাঠান সাজে সৈয়দ সে দেশে সৈয়দ খোদার পুত্র হইতে বাধা কোথায়। এইভাবে সে সবার গোমর ফাঁক করিয়া দিল। (আল এরতেবাত)

মোয়ামালাত ও সদাচরণ দ্বীনের বাহিরে নহে

মানুষ সাধারণতঃ মোয়ামালাত ও সদাচরণকে দ্বীনের বাহিরে মনে করে। কিন্তু তাজ্জবের বিষয় এই যে, তাহারা মোয়ামালাত (ব্যবহারিক বিষয়) ও সদাচরণকে সরকারী আইনের বাহিরে মনে করে না। কেহ কখনও সরকারের কাছে এই দাবী জানায় নাই যে, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদিতে সরকার কেন হস্তক্ষেপ করিবে? সরকারের কাজ তো শুধুমাত্র রাষ্ট্র পরিচালনা করা। অন্যান্য আর সব কাজ আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমাদিগকে লাইসেন্স ইত্যাদির জামেলায় পড়িতে হইবে কেন? এমন দাবী সরকারের কাছে কেহ করিতে পারে কি? (মাজারুল মা'সিয়াত, পৃষ্ঠাঃ ১০)

সদাচরণ দ্বীনের অঙ্গ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ -

এই আয়াতের এক অর্থ ইহাও যে, সমাজ সংস্কারেও আখিরাতে পুরস্কার পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ আহকামে শরীয়তের মধ্য হইতে যে বিষয়গুলিকে তোমরা নিছক দুনিয়াদারী বলিয়া মনে কর উহাতেও পুরস্কার মিলিবে। এই আয়াতে فسحت এবং قيام-এর উপরে আল্লাহ আখিরাতের সওয়াব দানের ওয়াদা করিয়াছেন। আর এইগুলি সামাজিক সদাচরণ সম্পর্কিত। এই সম্পর্কে কোন কোন ভণ্ড বলিয়া থাকে যে, মৌলবীরা শরীয়তকে তাবিজ বানাইয়া লইয়াছে। তাই তাহারা রুটি ছিড়িয়া খাওয়া, পানি পান করা ইত্যাদিকেও শরীয়তের অঙ্গ বলিয়া থাকে। এ ব্যাপারে আমার একটি কাহিনী মনে পড়িল।

এক ব্যক্তি ঈমানের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে একটি কিতাব লিখিয়াছিল। সে সংশোধনের জন্য উক্ত কিতাবখানি আমার কাছে পাঠাইল এবং ইহাও লিখিল যে, সে এই কিতাবটি তাহার এক উকিল বন্ধুকেও দেখাইয়াছিল। উকিল বন্ধুটি কিতাবখানা দেখিয়া বলিয়াছিল, ইহাই যদি ঈমান হয় তবে ঈমান তো শয়তানের নাড়িভূড়ি। (নাউযুবিল্লাহ)! ইহাতে কিতাব লেখক খুব দুঃখ পায় এবং সে তাহার উকিল বন্ধুকে যে চিঠি দিতে চাহিয়াছিল তাহাও সংশোধনের জন্য আমার নিকট পাঠাইয়াছে। আমি তাহাকে লিখিয়া জানাইলাম, উকিলকে চিঠি দিতে পারেন। তবে আমার মনে হয় তাহার ঈমান একেবারে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। চিঠিতে কিছু হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাহাকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করাই উত্তম। এইগুলি ঈমানের শাখা বলিয়া যদি ঐ কমবখতের জানা না থাকে তবে সে ভদ্র ভাষায় তাহা লিখিয়াও তো জানাইতে পারিত। আসল কথা এই যে, এলেম না থাকিলে বা আল্লাহ ওয়ালাদের ছোহবত না জুটিলে তাহার ঈমানের ভরসা নাই। এই কমবখত মূর্খতা বশতঃ কেমন কুফরী কথা বলিয়া বসিল! লোকে বলে, মৌলবীরা মানুষকে কাফের বানাইয়া ছাড়ে। আমি বলি, যদি মৌলবীরা মানুষকে কুফরী কথা বা কাজ শিক্ষা দেয় তখনই তাহাদিগকে এই অপবাদ দেওয়া যাইতে পারে। আর যখন ইহারা নিজেরাই মূর্খতা বা শয়তানী বশতঃ কুফরী করিয়া বসে তখন তো ইহারা নিজেরাই কাফের হইল। মৌলবীরা ইহাদিগকে কাফের বানাইল কিরূপে? ইহারা তাহা জানিতও না, মৌলবীরা ইহাদিগকে জানাইয়া দিয়াছে এই যা।

এই শ্রেণীর লোকেরা বলিয়া থাকে যে, সদাচরণ বা সামাজিকতা দ্বীনের অঙ্গ নহে। তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য বর্ণিত আয়াতটিই যথেষ্ট। আয়াতটিতে দুইটি অনুজ্ঞা বাচক শব্দ রহিয়াছে। আর তাহা ছাড়া আয়াতটিতে সওয়াবের ওয়াদাও রহিয়াছে। আর সওয়াব হয় দ্বীনের কাজে। সুতরাং আয়াতটির অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যে কাজকে তোমরা পার্থিব ব্যাপার বলিয়া মনে কর উহাই আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী করিলে তজ্জন্য সওয়াব পাওয়া যাইবে। আর আয়াত দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, সাধারণ ব্যাপারেও আল্লাহর আদেশ মানিয়া চলিলে উহাতেও লাভ আছে। (ফজলুল ইলমে ওয়ালা আমল)

দ্বিতীয় পাঠ

জনসেবা

জনসেবার গুরুত্ব

অন্যান্য দ্বীনি কাজের মতো অপরের উপকার করাও জরুরী। আল্লাহ বলেনঃ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ অর্থাৎ একে অপরের উপকার করিতে ভুলিও না। অপরের চিন্তা যে করে না সে তো পশু সমতুল্য। পশুর পরিচয় এই যে, একজনকে মরিতে দেখিয়াও সে নিশ্চিন্তে ক্ষেতের ফসল খাইতে থাকে। (মুয়াসাতুল মুজারেবীন, পৃষ্ঠাঃ ৭)

জনসেবার অর্থ কি?

জনসেবার অর্থ হইল কোন পুরস্কার বা পারিশ্রমিক ছাড়াই আল্লাহর সৃষ্টির সেবা করা।

জনসেবার প্রেরণা

অন্যান্য প্রেরণার মতো জনসেবার প্রেরণাও আল্লাহই মানুষকে দান করিয়াছেন। এই প্রেরণা কমবেশী সব মানুষের মধ্যেই আছে। কাহারও মধ্যে ব্যাপকভাবে অর্থাৎ সমগ্র জাতির বা সমগ্র জগতের সেবার প্রেরণা রহিয়াছে আর কাহারও মধ্যে রহিয়াছে সীমিত আকারে। অর্থাৎ সে শুধু নিজ পরিবার বা পরিবারের কয়েকজনেরই সেবা করিতে চায়।

জনসেবা উচ্চস্তরের আখলাক

জনসেবার প্রেরণা মানুষকে পরার্থে সবকিছু বিসর্জন দিতে শিক্ষা দেয়। নিজের আরাম ও মূল্যবান সময়কে বিসর্জন দিয়া অন্যের সেবা করা উঁচুস্তরের আত্মত্যাগ। আল্লাহ যাহাকে উচ্চস্তরের আখলাক দান করিয়াছেন শুধু তাহার নিকট হইতেই ইহা আশা করা যাইতে পারে।

জনসেবার সীমা

ইসলামের দৃষ্টিতে জনসেবার সীমা এই যে, জনসেবা করিতে গিয়া যেন নিজের দ্বীন ও ঈমানের কোন ক্ষতি করা না হয়। জনসেবা করিতে গিয়া যদি দ্বীন ও ঈমানের ক্ষতি হয় তবে এমন জনসেবা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। নিজের ব্যক্তিগত সুখ ও সুবিধা বিসর্জন দিয়া অন্যের উপকার সাধন তখনই প্রশংসনীয় হইবে যখন উহাতে নিজের দ্বীন ও ঈমানের কোন ক্ষতি না হয়। (আনফাসে ইসা, পৃষ্ঠাঃ ৩৭)

জাতির দরদী

মানুষ ভুল করিয়া ধনীদিগকেই জাতি মনে করিয়া থাকে। অথচ সংখ্যায় গরীবরাই বেশী। তাই জাতি বলিতে গরীবদেরকেই বুঝাইবে। সুতরাং জাতির দরদীও সে-ই যে গরীবের দরদী। (দ্বীন ও দুনিয়া, পৃষ্ঠাঃ ৩৬৭)

কর্জ দেওয়ার সওয়াব

মহানবী (সঃ) বলিয়াছেন, আমি জান্নাতের দরজায় লিখিত দেখিয়াছি যে, সদকা দিলে দশগুণ নেকী হয় আর কর্জ দিলে হয় আঠার গুণ। আমি জিবরাঈল (আঃ)-কে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, কর্জ শুধুমাত্র অভাবী লোকেরাই চাহিয়া থাকে। (কারণ উহা ফেরত দিতে হইবে।) পক্ষান্তরে সদকা এরূপ নহে। (কারণ উহা ফেরত দিতে হইবে না। তাই বিনা প্রয়োজনেও উহা মানুষের কাছে চাওয়া যায়।) তাই কর্জ দেওয়ার সওয়াব এত বেশী (যাহা সদকাতেও নাই)।

পুরাতন মাল দান করা

পুরাতন কাপড় বা জুতা সওয়াবের নিয়তে আল্লাহর নামে না দিয়া গরীবের সাহায্যের নিয়তে দান করা উচিত। এক্ষেত্রে গরীবের সাহায্য ছাড়া অন্য কোন নিয়ত করিও না। যদি ইহাতে আল্লাহ সওয়াব দেন তো ভালো কথা।

সৎকর্মের আদেশ

একে অপরকে সৎকার্যের আদেশ ও অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করিও। কাহাকেও জুলুম করিতে দেখিলে তাহাকে বাধা দিয়া তাহার কাজের গতিকে নেকী ও সওয়াবের দিকে ফিরাইয়া দিও। তাহা না হইলে আল্লাহ তোমাদের অন্তরেও জুলুম ও গোনাহের প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি করিয়া দিবেন। অতঃপর বানী ইসরাঈলের মতো তোমরাও আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত হইবে।

তৃতীয় পাঠ
জীবন ও স্বাস্থ্য

জীবন ও স্বাস্থ্যের গুরুত্ব

এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আপনি শিশুকালে মৃত্যুবরণ করিয়া নিশ্চিতভাবে বেহেশতে যাওয়া পছন্দ করেন না সাবালক হইয়া ঝুঁকির মধ্যে পড়া পছন্দ করেন? তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি সাবালক হইয়া ঝুঁকির মধ্যে পড়া পছন্দ করি। কারণ যদি আমি শিশুকালে মারা যাইতাম তাহা হইলে আল্লাহর মারেফাত লাভ করিতে পারিতাম না। এখন ঝুঁকির মধ্যে থাকিলেও আল্লাহর মারেফাত তো লাভ করিতে পারিয়াছি। বাকী আল্লাহর ইচ্ছা।' প্রকৃত প্রস্তাবে জীবন বড় কদরের জিনিস। কবি বলেন ঃ

عمر عزیز لائق سوزوگداز نیست * ایں رشته رامسوز که چندیں دراز نیست

সুতরাং আমি মনে করি স্বাস্থ্যের হেফাজত করা জরুরী। যদিও তাহা করিতে গেলে নফল ইবাদতের তওফিক নাও হয়। কারণ আশা করা যায়, সুখে থাকিলে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়া আল্লাহর দিকে তাহার মন ধাবিত হইবে। (কামালাতে আশরাফিয়া, পৃষ্ঠাঃ ২১৪)

জীবনের কদর করা উচিত

بده سواقی مئے باقی که در جنّت نخوا هی یافت

کنار آب رکنا باد وگلگشتِ مصلےٰ را

যে সকল আমলের দরুন উঁচু মর্যাদা পাওয়া যায় উহা জান্নাতে কোথায় পাওয়া যাইবে? উহা শুধু এই জীবনেই পাওয়া যায়। সত্যিই জীবন বড় কদরের জিনিস।

عمر عزیز لائق سوز وگداز نیست * ایں رشته را مسوزکه چندیں دراز نیست

(হুসনুল আজিজ, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৭)

স্বাস্থ্য ও জীবনের হেফাজত

শরীয়তে যতটুকু আরাম আয়েশ করিবার অনুমতি আছে ততটুকু করা উচিত। তবে ইহাতে যেন বাড়াবাড়ি না হয়। আর নিজের উপর অহেতুক কড়াকড়ি আরোপ করাও উচিত নহে। যেমন নিদ্রা প্রবল হইলে ঘুমাইতে যাওয়া উচিত।

ইহার বিপরীত করিতে গেলে অনেকে ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, অনেকে উন্মাদ হইয়া যায়। স্বাস্থ্য ও জীবনের হেফাজত করা কর্তব্য। কারণ ইহা আর পাওয়া যাইবে না। (কামালাতে আশরাফিয়া, পৃষ্ঠাঃ ২১৪)

মুস্তাহাব আমলের চেয়ে স্বাস্থ্য রক্ষার গুরুত্ব অধিক

মুস্তাহাব আমলের চেয়েও স্বাস্থ্য রক্ষার গুরুত্ব বেশী। যেমন ভোরের বায়ু সেবনের জন্য খোলা মাঠে যাওয়া মসজিদে ইশরাকের নামায আদায়ের জন্য সূর্যোদয় পর্যন্ত বসিয়া থাকার চেয়ে উত্তম। (কামালাতে আশরাফিয়া, পৃষ্ঠাঃ ২৬৪)

স্বাস্থ্যের হেফাজত সওয়াবের কারণ বটে

মাথায় তেল দিলে শরীরের কলকব্জাগুলি ঠিকমতো কাজ করিবে। এই নিয়তে মাথায় তেল দিলে আল্লাহ সওয়াব দিবেন বলিয়া আশা করা যায়। (দাওয়াতে আবদিয়াত)

একজন রোগীকে চিকিৎসক বেশী করিয়া ঘুমাইতে বলিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি মাওলানা থানবীকে লিখিল যে, ইহা করিতে গেলে তো আমার আমল কমিয়া যাইবে। ইহার জওয়াবে হযরত মাওলানা বলিলেন, চিকিৎসক যে পরিমাণ ঘুমাইতে বলিয়াছেন উহার চেয়েও বেশী করিয়া ঘুমাও। পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ না হওয়া পর্যন্ত আমল কমাইয়া দাও, সওয়াব পুরামাত্রায় পাইবে। (কামালাতে আশরাফিয়া, পৃষ্ঠা ঃ ৩০৪)

নিশ্চিন্তে থাকা

নানাবিধ চিন্তা-ভাবনার মধ্যে থাকিও না। অন্তরে দুঃখ আসিতে দিও না। অনেকে তো আজে বাজে কাজেই সময় কাটাইয়া দেয়। দুঃখ ও চিন্তা-ভাবনার অবকাশই পায় না। (কামালাতে আশরাফিয়া, পৃষ্ঠাঃ ১৭৮)

হারাম জিনিসে শেফা নাই

শরীয়ত যেসব বস্তুকে হারাম করিয়াছে ঐগুলিতে ক্ষতির উপাদানই বেশী। যদিও সব সময় ঐ ক্ষতি প্রকাশ পায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হারাম বস্তু দ্বারা যে শেফা লাভ হয় উহা প্রকৃত প্রস্তাবে শেফা নহে বরং উহা ব্যাধিকে দূর করিয়া আরেকটি ব্যাধির জন্ম দেয়। (আনফাসে ইসা, পৃষ্ঠা ঃ ৩১৯)

চতুর্থ পাঠ

কাফেরদের অনুকরণ

কাফেরদের অনুকরণ নিন্দনীয় কেন?

কাফেরদের অনুকরণ এই জন্য নিন্দনীয় যে, উহাতে কুফরী ও কাফেরদিগকে উত্তম বলিয়া প্রমাণ করা হয়। কারণ কাহাকেও উত্তম বলিয়া ধারণা না করিলে মানুষ তাহার অনুকরণ করে না। আর কাফেরদিগকে উত্তম বলিয়া ধারণা করা হারাম। (মলফুজাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৭)

কাফেরদের অনুসরণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা

দ্বীনি ব্যাপারে কাফেরদের অনুকরণ হারাম এবং জাতীয় আদর্শের ক্ষেত্রে তাহাদের অনুকরণ মকরূহ তাহরিমী। প্রশাসন ও আবিষ্কার ইত্যাদিতে তাহাদের অনুকরণ জায়েয। সে ক্ষেত্রে উহা অনুকরণই নহে। (আল হাদীদ, পৃষ্ঠাঃ ১৯)

জার্মানরা ইংরেজদের শত্রু। তাই বৃটেনের সেনাবাহিনী প্রধান তাহার সৈন্যদের জার্মান উর্দি পরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন। এ অধিকার তাহার অবশ্যই আছে। তাহা হইলে মহানবী (সঃ)-এর কি এই অধিকার নাই যে, তিনি আল্লাহর শত্রুদের চালচলন মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন?

তাশাব্বুহ বা অনুকরণ সম্বন্ধে বিস্তৃত কথা এই যে, যে সকল বস্তু শুধু কাফেরদের নিকটেই আছে এবং মুসলমানদের নিকট উহার বিকল্প নাই এবং ঐ বস্তু কাফেরদের জাতীয় আদর্শ বা ধর্মীয় বিষয়ও নহে, উহা গ্রহণ করা যাইতে পারে। যেমন বন্দুক, উড়োজাহাজ ইত্যাদি।

আর যে সকল আবিষ্কৃত বস্তুর বিকল্প আমাদের কাছে আছে ঐগুলিতে তাহাদের অনুকরণ মকরূহ। যেমন মহানবী (সঃ) পারস্য দেশীয় ধনুক ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِالْقَوْسِ الْعَرَبِيِّ بِهَا يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ 'তোমরা আরবীয় ধনুক ব্যবহার কর। ইহা দ্বারাই আল্লাহ তোমাদিগকে বিজয় দান করিবেন।' আর হইয়াছিলও তাহাই। আল্লাহ তায়ালা আরবীয় অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারাই সাহাবাদিগকে বিজয় দান করিয়াছিলেন।

মহানবী (সঃ) পারস্য দেশীয় পদ্ধতির ধনুক ব্যবহার করিতে এই জন্য নিষেধ করিয়াছিলেন যে, উহার বিকল্প হিসাবে আরবীয় ধনুক বর্তমান ছিল এবং এতদুভয়ের উপকারিতাও ছিল সমান। শুধুমাত্র পার্থক্য ছিল আকৃতিতে। ইসলাম আত্মমর্যাদায় বিশ্বাস করে। তাই যে সকল বস্তু মুলসানদের কাছেও আছে এবং

কাফেরদের কাছেও আছে এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আকৃতিগত, সে ক্ষেত্রে ইসলাম কাফেরদের অনুকরণ করিতে নিষেধ করিয়াছে এই কারণে যে, ইহাতে নিজদিগকে অন্য জাতির মুখাপেক্ষী বলিয়া প্রমাণ করা হয়। ইহা আত্মমর্যাদা-হানিকর।

তা'আসসুব ও তাসাল্লুবের পার্থক্য

অন্যায়ভাবে অপরের সাহায্য করাকে তা'আসসুব বলে। আর তাসাল্লুব হইল দ্বীনের উপর অটল থাকা। প্রথমটি নিষিদ্ধ ও দ্বিতীয়টির আদেশ করা হইয়াছে। (আনফাসে ইসা, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭৭)

তাশাব্বুহ শুধু শরীয়তের দৃষ্টিতেই নিন্দনীয় নহে, উহা বিবেক বিরোধীও বটে

অপরের অনুকরণ বিবেক বিরোধীও বটে। কোন সাহেব যদি তাহার বেগমের পোশাক পরিয়া এজলাসে আসিয়া বসে তাহা হইলে অবস্থাটা কি দাঁড়ায়? তাহার নিজের কাছে এবং দর্শকের কাছে কি ইহা খারাপ লাগিবে না? এই খারাপ লাগার একমাত্র কারণ হইল অনুকরণ। তাহা হইলে কাফেরদের অনুকরণ খারাপ হইবে না কেন? এক ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, আমরা যদি তুর্কী টুপি পরিধান করি তাহাতে তো আর সম্পূর্ণ পোশাকের অনুকরণ করা হয় না। আমি বলিলাম, তুর্কি টুপি পরিয়া বাকী পোশাক মহিলাদের ন্যায় পরিয়া লউন এবং বলুন যে, টুপিতো তুর্কীই পরিয়াছি ইহাতে আর অনুকরণ হইল কিসে? আসলে কথা হইল, অনুকরণ কখনও আংশিক হয় আর কখনও পূর্ণমাত্রায় হয় এবং উভয়টিই নিন্দনীয়। যদিও উভয়টির মধ্যে মাত্রার বেশ কম থাকে। (আল ইফাজাত, মলফুজঃ ৪৭৭)

ফ্যাশনের কুফল

ফ্যাশন এমন এক আপদ যাহা মানুষকে অন্ধ ও বধির বানাইয়া দেয়। অনেকেরতো দশা এই যে, দিবা-নিশি শুধু ফ্যাশন নিয়াই ব্যস্ত থাকে। আমি এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, যাহার পায়খানায় যাইবার পোশাক ছিল আলাদা, ঘরে বসার পোশাক ছিল আলাদা এবং কাহারও সহিত সাক্ষাতের পোশাক ছিল আলাদা, শুধু পোশাক বদলাইতেই তাহার সারাদিন চলিয়া যাইত। অনুকরণ আমাদিগকে এমনই অন্ধ বানাইয়াছে। আমাদের নিজেদের কি কিছুই নাই? মহানবী (সঃ) আমাদিগকে সবকিছুই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা বাদ দিয়া আমরা ভূতের বেগার দিতে শুরু করিয়াছি। (আওয়াজে কানোজ, পৃষ্ঠাঃ ২০)

কাফেরদের অনুকরণ হারাম তো বটেই অধিকন্তু ইহাতে পার্থিব ক্ষতিও রহিয়াছে। ফ্যাশনের বদৌলতে আমাদের অবস্থা তো এই যে, ফ্যাশনের সহিত তাল দিতে গিয়া আমাদের আয়ে কুলাইতেছে না। ফ্যাশনের পিছনে যে টাকা ঢালা হয় উহা কি অপচয় নহে? আমি অনেককে ভালো বেতন পাইয়াও ফ্যাশনের

পাল্লায় পড়িয়া ঋণগ্রস্ত হইতে দেখিয়াছি। পশ্চাত্যের অনুকরণ করিতে গিয়া ইহারা দ্বীনকে বিসর্জন দিয়াছে, সেই সঙ্গে দুনিয়াকেও। ফ্যাশনের পোশাক পরিলে তাহা অপরকে দেখাইবার ইচ্ছা জাগা খুবই স্বাভাবিক। নারী ফ্যাশনের পোশাক পরিলে তাহা অপরকে দেখাইতে চাহিবে এবং শুধু নারীদিগকে দেখাইয়া সে তৃপ্তি পাইবে না। এরপর সে পুরুষকেও দেখাইতে চাহিবে। আর এইভাবে পর্দাহীনতার প্রচলন হইতে থাকিবে। (আহকামুল মাল, পৃষ্ঠাঃ ৬০-৬৪)

অনুকরণেরও বৈশিষ্ট্য আছে

অনেকে বলিয়া থাকে, অনুকরণে কি আসে যায়? আমি বলি, যদি কিছুই না আসে যায় তাহা হইলে আজ হইতে মহিলাদের পোশাক পরিয়া অফিসে যাওয়া শুরু করুন। অনুকরণে কিছু আসে যায় কি-না তখন বুঝিবেন। অনুকরণের কুফল আছে। ইহাকে তুবড়ি মারিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকা জরুরী।

মানুষ ভালো জিনিসের অনুকরণ করে না

পোশাক ইত্যাদিতে মানুষ বিজাতীয়দের অনুরকণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে সমস্ত ভালো গুণ রহিয়াছে মানুষ সেগুলি গ্রহণ করে না। যেমন জাতির প্রতি দরদ, আয় বুঝিয়া ব্যয় করা, কাজকর্মে সহজ সরল হওয়া ইত্যাদি। আমাদের অবস্থা তো তেমনই যেমন এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, 'কোটের কাপড় কিনিয়াছি চার টাকা দিয়া, আর সেলাই বাবদ দিয়াছি ষোল টাকা এবং কোটটি সেলাই করিয়াছে এক বিলাতী সাহেব।' অর্থাৎ কষ্ট হউক, আর্থিক ক্ষতি হউক তবুও অনুকরণ চাই। (আহকামুল মাল, পৃষ্ঠাঃ ৫৯)

ইসলামী সদাচরণ তুলানাবিহীন

ইসলামী সমাজে গর্ব, বানোয়াট চালচলন এগুলির ঠাঁই নাই। ইসলাম মানুষকে নম্রতা ও বিনয়ের শিক্ষা দিয়াছে। বিনয় না থাকিলে পারস্পরিক সহানুভূতি ও ঐক্যবোধ থাকে না। মহানবী (সঃ) কথায় ও কাজে আমাদিগকে সামাজিক সদাচরণ শিক্ষা দিয়াছেন। যেমন খানাপিনার ব্যাপারে মহানবী (সঃ) বলেন, اٰكُلُ كَمَا يَاْكُلُ الْعَبْدُ অর্থাৎ দাস যেভাবে খায় আমিও সেভাবেই খাই। মহানবী (সঃ) সামনের দিকে ঝুঁকিয়া তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিতেন। আর আমরা খাই গর্ব ও অহংকারের সহিত। আসলে কথা হইল, যদি আমাদের এই প্রত্যয় জন্মে যে, এই খাবার আমরা আল্লাহর দরবার হইতে লাভ করিয়াছি এবং তিনি আমাদিগকে দেখিতেছেন তাহা হইলে আপনা আপনিই আমাদের খাওয়ার পদ্ধতি উহাই হইবে যাহা মহানবী (সঃ) বলিয়া গিয়াছেন। অন্তরে কাহারও প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকিলে সব কাজ সহজ হইয়া যায়। আল্লাহ যে আমাদিগকে দেখিতেছেন তাহা মহানবী (সঃ) দেখিতেন কিন্তু আমরা দেখি না। পার্থক্য

এখানেই। যদি আমাদের চোখ খুলিয়া যায় তাহা হইলে মহানবী (সঃ) যাহা করিয়াছেন উহাই আমরা করিব। যখন ইসলামেই উঁচু স্তরের আখলাকের শিক্ষা রহিয়াছে তখন আমরা অপরের অনুকরণ করিব কোন দুঃখে।

আমাদের জাতীয়তা বোধের পরিচয় তো ইহাই হওয়া উচিত যে, যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়াও লওয়া হয় যে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ তবুও আমরা বিজাতীয় সমাজ ব্যবস্থার অনুসরণ করিব না। কবি বলেন–

کہن خرقۂ خویش پیراستن * به ازجامۂ عاریت خواستن

অর্থৎ অন্যের নিকট হইতে ধার করা শাল অপেক্ষা নিজের ছেঁড়া কম্বলই উত্তম। কিন্তু নিজের শাল ফেলিয়া দিয়া অন্যের ছেঁড়া কম্বল পরিধান করা কোন সুস্থ মস্তিষ্কের কাজ হইতে পারে কি?

ইসলামী ও অনৈসলামী আচার আচরণের তুলনা

অনেকে পোশাকের ব্যাপারে বিজাতীয়দের অনুকরণ করিয়া থাকেন। অথচ ইসলাম পোশাকের ব্যাপারে যথেষ্ট উদার। কারণ ইসলামে বৈধ পোশাকের তালিকা দীর্ঘ এবং নিষিদ্ধ পোশাকের তালিকা সংক্ষিপ্ত। আর বিজাতীয় সংস্কৃতিতে নিষিদ্ধ পোশাকের তালিকা দীর্ঘ এবং বৈধ পোশাকের তালিকা সংক্ষিপ্ত। অনেকে উদারতার কথা বলিয়া থাকেন। ইহাই কি উদারতার নমুনা? অথচ ইসলাম এ ব্যাপারে কত উদার।

খাওয়ার ব্যাপারেও চেয়ার টেবিল না হইলে তাহাদের খাওয়া হয় না। আর আমরা খাটের উপরে, বিছানায় বা কলা পাতায় করিয়া যে কোন ভাবে খাইতে পারি।

বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ করিলে আমাদের জাতীয় সত্তা বলিতে কিছুই থাকে না। এতদ্ব্যতীত ইহাতে নিজেদের সংস্কৃতিকে দীন বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়। (তাফসিলুদদ্বীন, পৃষ্ঠাঃ ৬২-৬৬)

ইউরোপীয় সংস্কৃতির এক কীর্তি

ইউরোপের কোন এক শহরে চুরি শিক্ষাদানের স্কুল খোলা হইয়াছে। সরকার বাধা দিতে চাহিলে স্কুল কর্তৃপক্ষ বলিল, তরবারি চালনা শিক্ষার ন্যায় ইহাও একটি শিক্ষা। চুরি করিলে আপনারা শাস্তি দিবেন। ফলে সরকার নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। এই হইল ইউরোপের সংস্কৃতি। (আল ইফাজাত, মলফুজাতঃ ৩৪১)

সংস্কৃতির উন্নতির ফল

সংস্কৃতির বিকাশের সাথে সাথে ফেতনা ফাসাদও বড়িতেছে। ফলে সংস্কৃতি আমাদের মনোবেদনার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (আল ইফাজাতুল ইয়ওমিয়া, মলফুজঃ ৩৪)

কোন কোন পোশাক ও রীতি-নীতি গর্বের পর্যায়ভুক্ত

অহংকারী লোকদের ন্যায় পোশাক পরা, তাহাদের মতো চাল-চলন রপ্ত করা এইগুলিতেও অহংকারের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ইহাতে অন্তরে কালিমার সৃষ্টি হয় ও অন্তর বিগড়াইয়া যায়। এই ভাবে নিজের অবস্থার চেয়েও বেশী দামী পোশাক পরা, নিজের সামর্থ্যের চেয়েও বেশী সম্পদ জমা করা এইগুলি অহংকারের শাখা-প্রশাখা। আর যদি কাফেরদের অনুকরণে এইগুলি করা হয় তাহা হইলে উহা ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ (অন্ধকারের উপরে আরও অন্ধকার)-এর পর্যায়ভুক্ত হইবে। (আল ইফাজাত, মলফুজঃ ৭৭৯)

পাশ্চাত্যের নারীদের অনুকরণ আখলাক বিরোধী কাজ

আজকাল একশ্রেণীর নারীর মধ্যে পাশ্চাত্যের স্টাইলে নতুন ফ্যাশন চালু হইয়াছে। ইহারা পশ্চাত্যের নারীদের মতো হাতে কোন অলংকার পরে না। আমি বলি, অনুকরণ তো নাজায়েয বটেই অধিকন্তু এইগুলি আখলাক বিরোধীও বটে। কারণ পাশ্চাত্য স্টাইলের পোশাক পরিধান করিলে উহা অন্যকে দেখাইতে মন চাহিবে। আর নারীরা শুধুমাত্র অন্য নারীদিগকে দেখাইয়াই তৃপ্তি পাইবে না। পুরুষদিগকেও দেখাইতে চাহিবে। (আহকামুল মাল, পৃষ্ঠাঃ ৬০-৬৪)

নারীদের সমানাধিকার

আজকালকার তরুণ সমাজ যে নারীর সমানাধিকারের দাবী করে কার্যক্ষেত্রে কিন্তু তাহারাও নারীদিগকে সমান অধিকার দিতে পারে না। ইহারা পাশ্চাত্যের অনুকরণে নারীর সমানাধিকার দাবী করে। কিন্তু ইহা ভাবিয়া দেখে না যে, এই সমানাধিকারের ফল পাশ্চাত্যের জন্য কল্যাণকর হইয়াছে কি-না। আর তাহা ছাড়া উহারা বেদ্বীন জাতি। আমরা উহাদের অনুকরণ কিরূপে করিতে পারি? আজ ইহারা যাহাদের অনুকরণে সমানাধিকার দাবী করিতেছে খোদ তাহারাও এই সমানাধিকারকে পুরাপুরিভাবে প্রয়োগ করিতে পারে নাই। (শোয়াবুল ঈমান, পৃষ্ঠাঃ ৩)

নারীদের সমানাধিকার ও উইরোপবাসী

ইউরোপবাসীরা নারীর সমানাধিকারের দাপটে এখন নিজেরাই অস্থির। তাহারা এখন নারীদিগকে তাহাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় রত। আর এদিকে তোমরা তাহাদের অন্ধ অনুকরণ করিয়া সাহেব সাজিতে চাহিতেছ। (আত্তাসাইয়ুর, পৃষ্ঠাঃ ৩৭)

সুফীদের অনুকরণকারীদেরও কদর করা উচিত

বুযুর্গানে দ্বীনেরা বলেন, সুফীদের অনুকরণকারীদেরও কদর করা উচিত। কারণ ইহাদের অন্তরে সুফীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আছে বলিয়াই ইহারা সুফীদের অনুকরণ করিয়া থাকে। আর সে জন্যই ইহাদের কদর করা উচিত।

কাফেরদের অনুকরণ নিষিদ্ধ এই কারণেই। কারণ তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকিলে কেহ তাহাদের অনুকরণ করিত না। আর কাফেরদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন হারাম। মহানবী (সঃ) বলেন مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُ অর্থাৎ 'যে যে জাতির অনুকরণ করে সে উহাদের অন্তর্ভুক্ত।'

মহানবী (সঃ) কি আশা করেন না যে তাহার উম্মত তাহার অনুকরণ করুক

আরেকটি কথা আমার মনে পড়িল। মহানবী (সঃ) কি আশা করেন না যে, তাহার উম্মত তাহার অনুকরণ করুক? মহানবী (সঃ)-এর অনুসরণে যদি কোন লাভ নাও থাকে তবুও তাহার প্রতি ভালোবাসা থাকিলে এতটুকু চিন্তাই তো যথেষ্ট। আর যদি তুমি ঐ পর্যায়ে পৌঁছিতে না পারো এবং তাহার অনুসরণে কোন লাভ আছে কি-না জানিতে চাও তবে লাভের নিয়তেই তাহার অনুসরণ করিতে থাকো। তাহা হইলে তুমি জানিতে পারিবে যে, উহাতে কোন বরকত আছে কি-না। আমল না করিয়া শুধু বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা কোন কিছুর হাকীকত উপলব্ধি করা যায় না। এই কারণেই শরীয়তের হুকুম আহকাম মানিয়া চলার ফায়দা আমল করার পরেই বুঝা যায়, পূর্বে নহে। ঠিক যেভাবে ঔষধ সেবনের উপকারিতা ঔষধ সেবনের পরেই বুঝিতে পারা যায়। (আল ইফাজাত, পৃষ্ঠাঃ ১৭)

হযরত ওমর (রাঃ)-এর বায়তুল মোকাদ্দাস বিজয়

সিরিয়ার সেনাবাহিনী হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট এক আবেদনে জানাইল যে, বায়তুল মোকাদ্দাস জয় করা যাইতেছে না এবং সেখানকার পাদ্রী বলিয়াছে যে, বায়তুল মোকাদ্দাস বিজয়ীর চেহারার বর্ণনা আমাদের কিতাবে আছে। তোমরা তোমাদের খলিফাকে নিয়া আস। যদি তাহার চেহারা আমাদের কিতাবের বর্ণনানুযায়ী হইয়া থাকে তবে আমরা বিনা যুদ্ধেই কিল্লার দ্বার খুলিয়া দিব। নতুবা তোমরা কেয়ামত পর্যন্ত লড়াই করিয়াও বায়তুল মোকাদ্দাস জয় করিতে পারিবে না। তাই আমরা আপনাকে এখানে আসিতে অনুরোধ জানাইতেছি। তাহা হইলে হয়তো বিনা যুদ্ধেই কিল্লা ফতেহ হইতে পারে।

খলিফা এই চিঠির মর্মানুযায়ী বায়তুল মোকাদ্দাস সফরের ইচ্ছা করিলেন। যে খলিফার নাম শুনিয়া ইরান সম্রাট এবং হেরাক্লিয়াস পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিত তিনি রওয়ানা দিলেন তালি দেওয়া জামা পরিয়া এবং একটি উটে চড়িয়া। যে উটে কখনও তিনি চড়িতেন এবং কখনো চড়িত তাহার ভৃত্য।

আজকাল সাধারণ একজন অফিসারের আগমনে কত কি করা হয়! জনসাধারণকে নিজেদের পকেটের পয়াসা খরচ করিয়া সাহেবের জন্য খানাপিনার ব্যবস্থা করিতে হয়। খলিফার আগমনে কাহাকেও অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই। কারণ তিনি জনসাধারণের নিকট হইতে মুরগী, দুধ, ডিম কিছুই গ্রহণ করেন নাই।

কখনও উটে চড়িয়া আর কখনও পদব্রজে চলিয়া সিরিয়ার নিকটে পৌঁছিলে সেনাবাহিনী খলিফাকে অভ্যর্থনা জানাইতে আসিল। খলিফা তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। শুধুমাত্র বিশিষ্ট কয়েকজনই তাহাকে অভ্যর্থনা জানাইল। কয়েকজন সাহাবী আরজ করিলেন, আমিরুল মুমিনীন! আপনি শত্রুর দেশে আসিয়াছেন। তাহারা আপনাকে দেখিতে আসিবে। সুতরাং আপনার জন্য পোশাক পরির্তন করিয়া উত্তম পোশাক পরিধান করাই উত্তম। আর আপনি উট ত্যাগ করিয়া ঘোড়ায় আরোহণ করুন। তাহা হইলে ইহারা আপনার ইজ্জত করিবে। খলিফা বলিলেন, نحن قوم اعزنا الله بالاسلام অর্থাৎ আল্লাহ আমাদিগকে ইসলামের দ্বারা ইজ্জত দিয়াছেন। আমাদের ইজ্জত উত্তম পোশাকে নহে বরং আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত। শেষ পর্যন্ত সাহাবাদের পীড়াপীড়িতে তিনি তাহাদের আবেদন মানিয়া লইলেন। উত্তম পোশাক আনা হইল। তিনি উহা পরিধান করতঃ ঘোড়ায় অরোহণ করিলেন। দুই চার কদম চলিয়াই তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, তোমরা তো আর একটু হইলে ওমরকে শেষ করিয়াই ফেলিতে চাহিয়াছিলে। এই পোশাক এবং ঘোড়া আমার মনে ভাবান্তর আনিয়া দিয়াছে। তোমরা আমার তালি দেওয়া জামা ও উট আন। আমি উহাই ব্যবহার করিব।

উত্তম পোশাক পরিলে যদি হযরত ওমর (রাঃ)-এর মনে ভাবান্তর আসে তাহা হইলে আমরা আছি কোথায়? আমরা কিরূপে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারি যে, পোশাক আমাদের দ্বীন ও ঈমানের ক্ষতি করিবে না? হযরত ওমর (রাঃ) যাহা বলিয়াছেন نحن قوم اعزنا الله بالاسلام উহাই সত্য। আমরা যদি আল্লাহর অনুগত হইতে পারি তবে সাদাসিদা পোশাকেই আমরা ইজ্জত পাইব। নতুবা দামী পোশাকেও ইজ্জত পাওয়া যাইবে না। কবি বলেনঃ

زعشقِ نا تمامِ ماجمالِ یاد مستغنی است

بآب ورنگ وخال وخط چه حاجت روئے زیبارا

অর্থাৎ সুন্দর চেহারার জন্য মেকআপের প্রয়োজন নাই। উহা তো এমনিই সুন্দর।

অনুকরণ করা হয় কোন কিছুকে বড় জানিয়া, তাহা হইলে রাসূল (সঃ)-এর অনুকরণ কেন করা হয় না?

মহানবী (সঃ)-এর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আমাদের চালচলনে কোন পবিরর্তন আনিতে সক্ষম হয় না। আর বেদ্বীন জাতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধ এতই প্রবল যে তাহাদের অনুকরণ করিতে আমরা হারাম হালালকেও বিসর্জন দিয়া বসি। আমার এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর কেহ দিতে পারিবেন কি? যদি অনুকরণের জন্য কোন আযাব নাও হয় এবং শুধু আল্লাহ আমাদিগকে তাঁহার সামনে দাঁড় করাইয়া এই প্রশ্নই করেন যে, তোমাদের অন্তরে কি মহানবী (সঃ)-এর প্রতি শ্রদ্ধা বেশী ছিল, না দুনিয়ার রাজ-রাজড়াদের প্রতি, তাহা হইলে আমরা কি জবাব দিব? (জরুরতুল এ'তেনা বিদদ্বীন)

অবস্থার সংশোধনের জন্য কি করা উচিত

বুযুর্গানে দ্বীনের চালচলন রপ্ত কর এবং নেক আমল করিতে থাক। শত্রু ও মিত্রকে চিনিতে শিখ। ইসলামের অনুশাসনগুলিকে পালন ও শ্রদ্ধা করিতে শিখ। কোন একজনকে বড় মনে করিয়া তাহার আনুগত্য করিতে থাক এবং কাজের কথা বল। বাজে কথা বলিয়া কি লাভ? (আল ইফাজাত, পৃষ্ঠাঃ ১২)

পঞ্চম পাঠ
দেশাচার ও প্রথা

দেশাচারের সংজ্ঞা

আধুনিক যুগে সবকিছুতেই গর্ব ও বানোয়াট ঢুকিয়া পড়িয়াছে। খানা-পিনা, পোশাক এমনকি কোন কিছুই ইহা হইতে মুক্ত নহে। আর এ সম্পর্কে আমরা চিন্তাও করি না। বিবাহ ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে যাহা কিছু করা হয় শুধু উহাকেই প্রথা বলে না এবং প্রত্যেক অপ্রয়োজনীয় কাজকে প্রয়োজনীয় মনে করার নামই প্রথা। তাহা অনুষ্ঠানাদিতে হউক আর দৈনন্দিন ক্রিয়া-কলাপেই হউক। (তাফসিলুয যিকর)

বর্তমান যুগে দেশাচার অহংকারের উপরে প্রতিষ্ঠিত

আধুনিককালের প্রথাগুলিকে প্রথা মনে না করা আরও মারাত্মক। কারণ কোন পাপকে মানুষ পাপ মনে না করিলে উহা হইতে তাহার তাওবার আশাই করা যায় না। কারণ অনুতাপের নামই হইতেছে তাওবা এবং সেই কাজেই মানুষ অনুতপ্ত হয় যাহাকে সে খারাপ বলিয়া জানে। প্রচলিত প্রথাগুলিকে মানুষ খারাপ মনে না করিলে তজ্জন্য তাহারা অনুতপ্ত হইবে না। আর অনুতপ্ত না হইলে আর তাওবা কিসের? প্রথা শিরক ও কুফর ভিত্তিক হইতে হইবে এমন কোনও কথা নাই। আগের যুগের প্রথাগুলি ছিল বড় আর আধুনিক কালের প্রথাগুলি ছোট এই যা তফাৎ।

দেশাচার মূর্খদের অনুকরণ বৈ আর কিছুই নহে

সব প্রথাই বর্জনীয়। এইগুলির ফায়দা হিসাবে যাহা কিছু বলা হয় উহাও মনগড়া। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও এখানে আসিয়া বোকা বনিয়া যান এবং ঐগুলির অনুকরণ করিতে শুরু করেন। এমন অনেক প্রথা আছে যেগুলির লাভালাভ বা উৎপত্তির কারণ কোনটাই আমাদের জানা নাই। তবুও আমরা ঐগুলি পালন করিয়া চলি। ইহা কি অন্ধ অনুকরণ নহে? আর তাহা ছাড়া এইগুলি পালন করাতে শরীয়তের অনুকরণ তো হয়ই না কোন জ্ঞানী ব্যক্তিরও অনুকরণ হয় না। যাহা হয় তাহা মূর্খদের অনুকরণ। আর মূর্খদের অনুকরণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ অন্যত্র বলেনঃ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى আল্লাহ উম্মুল মুমিনীদিগকে বলিয়াছেন, তোমরা জাহেলিয়াতের যুগের নারীদের মতো যত্রতত্র বাহির হইও না। আর অন্যত্র বলেন, তোমরা কি জাহেলিয়াতের যুগের রীতিনীতি পছন্দ করিবে?

এই প্রথাগুলি ইসলামী প্রথা নহে

অনেক প্রথা সম্বন্ধে মানুষ বলিয়া থাকে যে, এইগুলি তো আবহমানকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। আমি বলি, এইগুলি সবই কাফেরদের প্রথা।

চরম মূর্খতা ও অন্তরের মৃত্যু

প্রথাসমূহ সবই কাফেরদের নিকট হইতে আসিয়াছে। উহার সহিত আরও যুক্ত হইয়াছে গর্ব, মহানবী (সঃ)-এর বিরোধিতা এবং বেদয়াত। একেবারে ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ (অন্ধকারের উপরে আরও অন্ধকার)। কিন্তু তাই বলিয়া প্রথাকে প্রথা না বলা এবং ফেতনাকে ফেতনা না বলা তো আরও মারাত্মক। ইহা চরম মূর্খতা ও অন্তরের মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নহে। তোমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পারো কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিও যে, তোমরা স্বীকার কর আর নাই কর পাপ পাপই। পাপের প্রতিক্রিয়া অবশ্যই দেখা দিতে বাধ্য। কেহ যদি বিষকে শরবত মনে করিয়া পান করে তবে বিষ তাহাকে রেহাই দিবে কি? কিছুক্ষণের মধ্যেই উহার মজা টের পাওয়া যাইবে।

প্রথাসমূহ বেদয়াত ও উহা শিরক পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছে

অতীতকালের প্রথাসমূহ যদি শিরক পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছে তবে আধুনিক কালের প্রথাসমূহ নিশ্চয়ই বেদয়াত পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছিবে। আর বেদয়াত অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গেলে উহা শিরক পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছে। সুতরাং উভয়ের পরিণতি একই। (তাফসিলুয যিকর)

মহানবী (সঃ) নাম, যশ ও রিয়া ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন

এই সব প্রথার অন্যবিধ কুফল না থাকিলেও ইহা কি কম ক্ষতি যে, এইগুলিতে মানুষের ভালো নিয়ত থাকে না। আর কেহ ইহার কুফল বুঝিতে না পারিলেও এইগুলির কুফলের জন্য ইহা কি যথেষ্ট নহে যে, মহানবী (সঃ) নাম, যশ ও রিয়ার উদ্দেশ্যে কোন কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন? (দ্বীন ও দুনিয়া, পৃষ্ঠাঃ ৫৩৭)

প্রকৃত অশুভ লগ্ন

কোন অনুষ্ঠানের দরুন যদি নামায বর্জন করার প্রয়োজন হয় তবে শরীয়তে এমন ধরনের অনুষ্ঠানই জায়েয নাই। অনুরূপভাবে কোন অনুষ্ঠানের দরুন যদি মাত্র এক ওয়াক্তের নামায বর্জন করার প্রয়োজন হয় তবে উহাই উক্ত অনুষ্ঠানকে খারাপ নামে অভিহিত করার জন্য যথেষ্ট। আর এদিকে আমাদের কোনই মনোযোগ নাই। আমরা এইগুলিকে আনন্দের অনুষ্ঠান মনে করি এবং তজ্জন্য শুভদিন ও শুভলগ্ন খুঁজিয়া বেড়াই। কিন্তু এই শুভাশুভ নির্ণয় জায়েয কি-না তাহাও আমরা চিন্তা করি না। বিবাহের জন্য গণকের নিকট হইতে শুভলগ্ন

জানিয়া লওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃত অশুভলগ্ন যে কি তাহা কেহ জানে না। যে মুহূর্তে আমরা আল্লাহর যিকর হইতে গাফেল থাকি উহাই প্রকৃত অভশুলগ্ন। যে সময়ে আমরা নামায ছাড়িয়া দেই উহার চেয়েও অশুভ সময় আর কি হইতে পারে? যে সকল কাজকর্ম আমাদের নামাযের জন্য বাধা হইয়া দাঁড়ায় উহার চেয়েও অশুভ কাজকর্ম আর কিছু আছে কি? (মুনাজায়াতুল হাওয়া)

অধিকাংশ প্রথা মদ জুয়ার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ .... فَهَلْ اَنْتُم مُّنْتَهُوْنَ -

অর্থাৎ শয়তান মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শক্রতার সৃষ্টি করে এবং তোমাদিগকে নামায হইতে দূরে রাখে। এই আয়াতে আল্লাহ মদ ও জুয়ার দুইটি কুফলের কথা বলিয়াছেন।

আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, শক্রতা সৃষ্টি এবং নামায ও যিকর হইতে মানুষকে দূরে রাখার অস্ত্র হইতেছে দুইটি জিনিস– মদ ও জুয়া। সুতরাং যে সকল কাজ মানুষকে আল্লাহর যিকর হইতে ফিরাইয়া রাখে শরীয়তের মূলনীতি অনুযায়ী ঐগুলিও মদ ও জুয়ার পর্যায়ভুক্ত। হাদীসেও আছে, মহানবী (সঃ) বলেনঃ

كُلُّ مَا الْهَاكَ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ

অর্থাৎ যাহাই তোমাকে আল্লাহর যিকর হইতে দূরে সরাইয়া রাখে উহাই জুয়া।

বর্ণিত আয়াত ও হাদীসের আলোকে আমাদের প্রথাসমূহকে বিচার করিলে দেখা যায় যে, আমাদের প্রথাসমূহও মদ ও জুয়ার পর্যায়ভুক্ত। কারণ এই সকল প্রথা ও অনুষ্ঠানাদিতে নামাযের কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় না। আর মদ ও জুয়াকে কোরআনের পরিভাষায় 'শয়তানের কাজ' বলা হইয়াছে।

এই আলোচনার আলোকে শরীয়তের দৃষ্টিতে আমাদের প্রথাসমূহের স্থান কোথায় তাহা বুঝিয়া লইতে বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু বুঝিবে তো সেই যাহার অন্তরে এই কথাগুলি দাগ কাটিবে। একথা তো সবারই জানা যে, তরকারিতে মসলা না দিলে উহা তরকারিই হইবে না। আর যাহারা মরিচ বেশী খায় তাহাদিগকে কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার যদি মরিচ বেশী খাওয়ার ক্ষতিকর দিকগুলি বলিয়া দেন তবুও উহারা তাহা মানিতে চাহিবে না। বরং ইহাই বলিবে, রাখো তোমার ডাক্তারী বিদ্যা। জীবন ভরিয়া এত মরিচ খাইলাম কিছুই তো হইল না। মরিচ ছাড়া আবার তরকারিতে স্বাদ হয় নাকি? মুসলমানদের অবস্থাও ঠিক

এমনই। যুগ যুগ ধরিয়া বিজাতীয়দের সংস্পর্শে থাকিয়া উহাদের আচার অনুষ্ঠানগুলি আমাদের সংস্কৃতিতে এমনভাবে বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে যে, উহা না হইলে আমাদের কোন অনুষ্ঠানই জমে না। ঘরসংসার গোল্লায় যাক কিন্তু এইগুলি বাদ দেওয়া যাইবে না।

আজকাল কোন সাধারণ মানুষও গরীবদের সহিত মিশিতে চায় না। নিজের হাতে কোন কাজ করিতে লজ্জাবোধ করে। ইহাদের কথাবার্তা, চালচলনে অহংকার ও বানোয়াট ভরা। বানোয়াট চালচলনে গোনাহ তো আছেই এতদ্ব্যতীত উহার একটি কুফল ইহাও যে, তাহার কথায় কেহ বিশ্বাস করিতে চায় না এই ভয়ে যে, হয়তো এই কথাটিও তাহার বানোনো। আর আজকালকার প্রথাগুলিতে শিরক না থাকিলেও আত্মগরিমা তো আছেই।

মরণকালেও চেহলামের ওসিয়ত

এই সকল কুপ্রথা যে পাপ তাহা মানুষ মনেই করে না। এমনকি কোন প্রথা বাদ থাকিয়া গেলে মানুষ মরণকালে ধূমধাম করিয়া চেহলাম করার জন্য ওসিয়ত করিয়া যায়। অনেকের আবার ওসিয়তেও বিশ্বাস নাই। তাই নিজের জীবদ্দশাতেই চেহলাম করিয়া তারপর মরে। নামায কাযা হইলে তজ্জন্য কোন পরোয়া নাই। আর চেহলামের এমনই মহিমা যে, জীবদ্দশাতে হইলেও উহা করিতে হইবে। আল্লাহর কাজের কোন দাম নাই আর শয়তানের কাজের এত দাম? মরণকালে আল্লাহর সান্নিধ্যে যাওয়ার সময়েও ইহাদের মাথায় থাকে পাপের চিন্তা অথচ তখন তো লজ্জিত হওয়াই ছিল বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সেই অনুভূতিও যদি না থাকে তবে তাহাকে আর কথা বলার থাকে কি? (মুনাজায়াতুল হাওয়া)

সত্য প্রকাশ পাক ও প্রথাসমূহ দূরীভূত হউক

সমাজের সংশোধনের জন্য আমি দুইটি জিনিস কামনা করি– (১) মানুষ প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যকার পার্থক্য বুঝিতে শিখুক। (২) প্রথাসমূহ দূর হউক ও সত্য প্রকাশ পাক। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই কথা শুনিয়া ঘাবড়াইয়া যায়। তাহারা কুপ্রথার অন্ধকারেই থাকিতে পছন্দ করে এবং সংশোধন কামনা করে না। (মলফুজাত, পৃষ্ঠাঃ ৫৪)

সত্যকে গ্রহণ করিবে, না বাতিলকে?

ভুলের মধ্যে থাকা এবং ভুলকে ভুল মনে না করার চেয়ে সত্য বা মিথ্যার কোন একটিকে গ্রহণ করা বরং ভালো। কেহ যদি ভুলের মধ্যে থাকে কিন্তু সে উহাকে ভুল বলিয়া জানে তাহা হইলে আশা করা যায় যে, কোন না কোন সময়

সে ভুলকে ত্যাগ করিবে। আর যে ব্যক্তি ভুলকে ভুল বলিয়াই স্বীকার করে না তাহার সংশোধনের আর আশা কোথায়? কেহ তাহার ভুল ধরিয়া দিলে সে তো ইহাই বলিবে যে, ইহাতে আর দোষের কি আছে? এই শ্রেণীর লোকেরা আজীবন পাপে লিপ্ত থাকে এবং মরণ কালে ইহাদের তওবা নসিব হওয়ার আশা করা যায় না। সুতরাং রসমগুলিকে রসম মনে না করা ভুল। এইগুলি বর্জন করিবার জন্য সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

ইসালে সওয়াবের উত্তম পদ্ধতি

আজকাল কেহ মারা গেলে তাহার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, মিছিল বাহির করা হয়, তাহার মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়, শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, পত্রিকায় সংবাদ ছাপা হয় ইত্যাদি। কিন্তু এই সব ক্রিয়াকর্মে তাহার কোন লাভ হয় কি?

আমি যখন কানপুর জামেউল উলুম মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলাম তখন আমার ছোট বোনের ইন্তেকাল হয়। এই সংবাদ যখন চিঠি মারফত আমার কাছে পৌঁছে তখন আমি ক্লাসে পড়াইতে ছিলাম। আমি ছাত্রদিগকে এই সংবাদ দেই নাই এবং পড়ানোও বন্ধ করি নাই। কিন্তু তবুও আমার চেহারায় সে শোকের ছাপ ফুটিয়া উঠিল, তদ্দরুন ছাত্ররা জানিতে চাহিল যে চিঠিতে কোন দুঃসংবাদ আছে কি না? তখন আমি তাহাদিগকে জানাইলাম যে আমার ছোট বোনের ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। ছাত্ররা বলিল, আমরা আজ আর ক্লাস করিব না। তখন আমি তাহাদিগকে ক্লাস করিতে বলিলেও তাহারা আর ক্লাস করিতে রাজী হয় নাই এবং আমিও আর তাহাদিগকে এজন্য পীড়াপীড়ি করি নাই। অতঃপর তাহারা কুরআন পড়িয়া মরহুমার রূহের উদ্দেশ্যে সওয়াব পৌঁছাইবার জন্য আমার অনুমতি চাহিল। আমি বলিলাম, আমি এজন্য কাহাকেও কষ্ট দিতে চাহি না। ইসালে সওয়াবের (অন্যের প্রতি সওয়াব পৌঁছানোর) ফজিলত অনেক। তাই তোমরা যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইসালে সওয়াব করিতে চাও তবে তাহা করিতে পারো। তবে তাহার পদ্ধতি এই হইবে যে, সকলে একত্রিত হইয়া নহে, বরং যে যাহার ঘরে বসিয়া যতটুকু ইচ্ছা কুরআন পড়িবে এবং যাহার ইচ্ছা না হয় সে পড়িবে না। আর কে কতটুকু পড়িয়া বখশাইয়া দিয়াছ তাহাও আমাকে জানাইও না। কারণ তাহা আমাকে শুনাইবার জন্য অনেকে মনে করিবে যে অন্ততঃ পাঁচ পারার কম পড়ি কেমন করিয়া! অথচ আমাকে শুনাইবার নিয়তে পাঁচ পারা পড়িলে উহার এক অক্ষরও কবূল হইবে না। আর যদি কেহ খালেছ নিয়তে মাত্র একবার কুলহুয়াল্লাহ পড়িয়া বখশাইয়া দেয় তবে তাহা কবূল হইবে এবং তদ্দ্বারা মৃত ব্যক্তির উপকার হইবে। অতঃপর ছাত্ররা প্রত্যেকে তাহাদের তৌফিক অনুযায়ী যে

যাহা পারে পড়িয়া আমাকে না জানাইয়া বখশাইয়া দিল। কেহ মারা গেলে সেক্ষেত্রে করণীয় তো ইহাই।

এক্ষেত্রে আমি যদি মাদ্রাসা বন্ধ দিতাম, শোক সভা করিতাম, পত্রিকায় তাহার মৃত্যু সংবাদ ছাপাইতাম তবে তাহাতে তাহার কি উপকার হইত? আর আমরা শোক সভায় মৃত ব্যক্তির যেসব অবাস্তব প্রশংসা করি হাদীসে আছে তজ্জন্য মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হয়– هٰكَذَا كُنْتَ (তুমি কি এইরূপ ছিলে?) আমাদের প্রশংসার ফলে তাহাকে উল্টা জবাবহিদী করিতে হয় এবং তিরস্কৃত হইতে হয়। আত্মীয় স্বজন ও ভক্তদের ভালোবাসার এই হইল পুরস্কার! এজন্য মৃত ব্যক্তি দায়ী নহে। কিন্তু তিরস্কৃত হইবার কালে আযাবের আশংকা তো থাকেই।

হযরত ঈসা (আঃ)-কে কেয়ামতের দিন এই প্রশ্ন করা হইবে– يٰعِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ তুমি কি মানুষকে বলিয়াছিলে যে, তোমার আমাকে ও আমার মাতাকে মা'বূদ বানাইয়া লও? ইহার উত্তরে তিনি বলিবেনঃ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَاۤ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ এ ক্ষেত্রে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু তবুও তাহাকে তাহার ভক্তদের অতিভক্তির বদৌলতে জবাবদিহীর সম্মুখীন হইতে হইবে এবং ইহাও এক ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি বটে। (মলফুজাত ৭ম খণ্ড, মলফুজঃ ২২০)

ষষ্ঠ পাঠ
পর্দা ও পর্দাহীনতা

পর্দাহীনতা ও বেহায়াপনার পরিণাম

পর্দাহীনতায় দেশ ছাইয়া গিয়াছে এবং আমরা এক ভয়ংকর পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছি। বেহায়পনা আগেও ছিল। আধুনিককালে উহার সহিত যুক্ত হইয়াছে বেপরোয়া ভাব। শুধু তাহাই নহে, বেপর্দার পক্ষে তাহারা কোরআন ও হাদীস হইতে প্রমাণও পেশ করিয়া থাকে। ইহা দ্বীনকে বিকৃত করা ছাড়া আর কিছুই নহে। এইভাবে চারিদিক হইতে দ্বীনের উপরে আক্রমণ চলিতেছে। মানুষ আজ পশুর ন্যায় স্বাধীন। যদি ইলামী রাষ্ট্র থাকিত এবং বাদশাহ দ্বীনদার হইতেন তাহা হইলে বুঝা যাইত যে, শরীয়ত বিরোধী কথা বলার হিম্মত আছে কাহার? এখন তো শাসক গোষ্ঠীই যতসব বেহায়াপনার অনুমিত দিয়া থাকে। যদি শরীয়তের দণ্ডবিধি চালু থাকিত, যদি চুরি করিলে হাত কাটা যাইত, ব্যভিচারের দায়ে দোররা মারা হইত তাহা হইলে এই সব গর্হিত কাজ করিতে কেহ সাহসই পাইত না। আর এখন মানুষ বল্গাহীন। যাহা ইচ্ছা করিতে পার, কেহ কিছু বলিবে না। এই কারণেই দুনিয়া হইতে খায়ের ও বরকত চলিয়া গিয়াছে। নানা প্রকার বিপদাপদ অবতীর্ণ হইতেছে। কিন্তু তবু কেহ ইহা হইতে উপদেশ লাভ করিতেছে না। (আল ইফাজাত, পৃষ্ঠাঃ ৭১)

পর্দার আয়াতে কাহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে?

আজকাল মানুষের মন মেজাজ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তাই তাহারা বলে যে, পর্দার আয়াতে তো শুধুমাত্র উম্মুল মুমিনীনদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে। ইহার উত্তর এই যে, যদি আমরা ধরিয়াও লই যে, পর্দার আয়াতে শুধু তাহাদিগকেই সম্বোধন করা হইয়াছে তবুও বলিতে হয় যে, তাহাদের মধ্যে ফেতনার আশংকা ছিল সামান্য। সেখানেও যখন পর্দার নির্দেশ দিয়া ফেতনার মূলোৎপাটন করা হইয়াছে তখন আমাদের ক্ষেত্রে তো পর্দার প্রয়োজন আরও বেশী। অনেকে প্রশ্ন করে যে, পাজামা, কোর্তা, আচকান এগুলি তো মহানবী (সঃ)-এর যুগে ছিল না। এগুলি আপনারা পরেন কেন? এগুলি তো বেদয়াত। এক ব্যক্তি ইহার বড় সুন্দর জবাব দিয়াছিল। তাহা এই যে, তোমরাও তো মহানবী (সঃ)-এর যুগে ছিলে না। সুতরাং তোমরাও বেদয়াত। আশ্চর্য নহে যে, হয়তো কোন দিন এমন কথাও শুনিতে হইবে যে, কুরআনে আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলা হয় নাই। কারণ আমরা সে যুগে ছিলাম না।

اے بسرا پردۂ یثرب بخواب * خیز که شد مشرق ومغرب خراب

আত্মগরিমা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে। প্রত্যেকেই নিজেকে বড় বলিয়া মনে করে। (হুসনুল আজিজ, পৃষ্ঠাঃ ১৬৩)

পর্দাহীনতার প্রবক্তাদের কয়েটি বৈশিষ্ট্য

এক ব্যক্তি ঠিকই বলিয়াছেন যে, পর্দাহীনতার প্রবক্তাদের মধ্যে দুইটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। একটি বেহায়াপনা ও অপরটি অশ্লীলতা। বাস্তবিকই এমন ধরনের লোকেরাই বেপর্দার উস্কানি দিয়া থাকে। দ্বীনের সহিত যাহাদের সম্পর্ক নাই। কিন্তু দ্বীন না থাকিলেও আত্মপরিচয় বলিয়া তো কিছু থাকা উচিত। (আল ইফাজাত, মালফুজঃ ২৮৭)

পর্দাহীনতার প্রবক্তাগণ অপরিণামদর্শী

বেপর্দার প্রবক্তাগণ ইহার পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ। ইউরোপে পর্দাহীনতার বদৌলতে নারী এমন অধঃপতনে গিয়াছে যে, পুরুষেরা দিশাহারা ও অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা কিছুই করিতে পারিতেছে না। (আল ইফাজাত, মলফুজঃ ২৭২)

পর্দা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি

প্রগতিবাদীরা বলিয়া থাকে যে, পর্দার দরুন নারীরা শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি করিতে পারে না। আসল কথা এই যে, শিক্ষিতা হওয়া না হওয়ার সহিত পর্দা বা বেপর্দার কোন সম্পর্ক নাই। বরং শিক্ষার জন্য প্রয়োজন আগ্রহের। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ থাকিলে পর্দার মধ্যে থাকিয়াও শিক্ষিতা হওয়া যায় নতুবা বেপর্দায় চলিয়াও মূর্খ থাকিতে হয়।

সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, শিক্ষার জন্য একাগ্রতার প্রয়োজন আর তজ্জন্য নির্জন পরিবেশই উপযুক্ত। তাই দেখা যায়, পড়াশোনার জন্য ছাত্ররা নির্জন পরিবেশ বাছিয়া লয়। সুতরাং নারীদের শিক্ষার জন্য পর্দার পরিবেশ আরও বেশী উপযোগী। কিন্তু মানুষ ইহার উল্টাটাই বুঝিয়া থাকে। (মাজাহেরুল আমাল)

পর্দার ত্রুটিসমূহের ও পর্দাহীনতার মধ্যে পার্থক্য

পর্দার ক্ষতিসমূহের প্রতিকার সম্ভব কিন্তু পর্দাহীনতার দরুন যেসব ফেতনা ফাসাদের উৎপত্তি হয় ঐগুলির প্রতিকার অনেক কঠিন। (আনফাসে ইসা, পৃষ্ঠাঃ ৩০৯)

পর্দার মধ্যেও পর্দাহীনতা

অনেকে বলিয়া থাকে যে, পর্দার মধ্যেও তো অনেক সময় অঘটন ঘটিয়া যায়। ইহার উত্তর এই যে, উহাও ঘটে পর্দার শিথিলতার কারণে। অর্থাৎ পর্দার

মধ্যে ক্রটি করিলে অঘটন ঘটে আর পর্দা করিতে কোনরূপ ক্রটি না করিলে অঘটন ঘটিবার কোনই আশংকা নাই। (আব-ইবকা, মার্চ, ১৯৪৯)

অনেক ক্ষতির পরে সত্যের উপলব্ধি

পর্দাহীনতার ভয়াবহ পরিণাম আমাদের সামনে আসিতেছে। কিন্তু নির্বোধেরা উহা তখনই বুঝিবে যখন আর কিছুই করিবার থাকিবে না। খুব শীঘ্রই ইহাদের চৈতন্যোদয় হইবে। (আল-ইফাজাত, পৃষ্ঠাঃ ১৭৮)

ইহারা দ্বীনকে নফস ও খাহেশের অনুগত বানাইয়া লইয়াছে

যাহারা পর্দাহীনতার প্রবক্তা তাহাদের মধ্যে আত্মোপলব্ধি বলিতে কিছুই নাই। শরীয়তের কথা বাদ দিলেও আত্মপরিচয় বলিয়াও তো কিছু থাকা উচিত। ইহাদের তাহাও নাই। ইহারা দ্বীনকে দুনিয়ার কামনা বাসনার দাস বানাইয়া লইয়াছে। (আল-ইফাজাত, মলফুজঃ ৭৫৪)

পর্দা কি আত্মীয় স্বজনদের পারস্পরিক সম্প্রীতির অন্তরায়?

কোন পর্দানশীল নারী গায়ের মোহাররাম আত্মীয়গণ হইতে পর্দা করিয়া চলিলে চারিদিক হইতে তাহার উপর টীকা টিপ্পনীর মাধ্যমে আক্রমণ শুরু হইয়া যায়। যেমন কেহ চাচাতো ভাইয়ের সামনে না গেলে লোকে বলে, ভাইয়ের সামনে আবার কিসের পর্দা? চাচাতো ভাই তো আপন ভাইয়ের মতোই, ইত্যাদি। অনেকে বলে, অমুকের বাড়ী গিয়া কি দেয়ালের সঙ্গে কথা বলিব? ওখানে যাওয়াই বন্ধ করিয়া দিতে হইবে দেখিতেছি।

যদি আমরা ধরিয়া লই যে, পর্দা পারস্পরিক প্রীতি বন্ধনের অন্তরায় তাহা হইলে তো প্রথমেই আল্লাহর বিধানের উপরে প্রশ্ন তুলিতে হয় যে, তিনি আত্মীয়দিগকেও গায়ের মোহররাম করিয়া দিয়াছেন কেন? পর্দা করিতে গেলে যদি কেহ অসন্তুষ্ট হয় হউক। তাহাতে কিছু আসে যায় না। এ ব্যাপারে কাহারও পরোয়া করা যাইতে পারে না। কেহ যদি ইহাতে অসন্তুষ্ট হয় তবে সে অসন্তুষ্ট হইয়া আর করিবেই বা কি? পর্দা করিতে গিয়া যদি আত্মীয় স্বজনকে বর্জন করার প্রয়োজন হয় তবুও তাহা করিতে হইবে। সব সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গেলে তখন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়িয়া তোলা আরও সহজ হইবে।

আমাদিগকে আল্লাহর হইতে হইবে। সামাজিক বাধা-বন্ধন যত কম হয় ততই ভালো। আর আমাদের ইহাও চিন্তা করা প্রয়োজন যে, সবাইকে খুশী করা যায় না। সুতরাং এক আল্লাহকে খুশী করিতে হইবে এবং তজ্জন্য যদি অন্য সবাইকে বর্জন করার প্রয়োজন হয় তবুও ভাল। (তরিকুল কালান্দার)

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ অর্থনীতি

প্রথম পাঠ

ইসলাম ও প্রগতি

ইসলামে প্রগতির গুরুত্ব

লোকে বলিয়া থাকে, মৌলবীরা সব উন্নয়মূলক কাজে বাধা দেয়। আমি বলিতে চাই, তোমরা প্রগতিকে জরুরী মনে কর তোমাদের জ্ঞান বুদ্ধির আলোকে আর আমি কোরআনের আয়াত দ্বারা উহাকে ফরয প্রমাণ করিব। আল্লাহ বলেনঃ

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির নির্দিষ্ট কেবলা রহিয়াছে যে দিকে তাহারা মুখ ফিরায়। তোমরা নেক আমল করিয়া একে অপরের আগে যাইবার চেষ্টা কর। আল্লাহ এই আয়াতে আমাদিগকে একে অপরের আগে যাইবার নির্দেশ দিয়াছেন। আর ইহারই নাম প্রগতি। সুতরাং প্রগতির প্রয়োজনীয়তা কোরআন হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। এখানে فَاسْتَبِقُوْا শব্দটি অনুজ্ঞা বাচক। তাই যদি বলা হয় যে, ইসলামে প্রগতি অর্জন করা ফরয তাহা হইলে আমাদের প্রগতি রোধ করে কাহার সাধ্য?

কিন্তু তোমাদের ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে এক জায়গায়। তাহা এই যে, তোমরা বিজাতীয়দের অনুকরণ করিয়া প্রগতি করিতে চাও আর আমরা চাই কোরআনের নির্দেশিত পথ ধরিয়া উন্নতি করিতে। (আল ইবরাহ বেজাবহিল বাকারা, পৃষ্ঠাঃ ২৫)

কৃষি ও বাণিজ্যের গুরুত্ব

বাকী রহিল দুনিয়ার সম্পদ অর্জন। উহা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে শুধু জরুরীই নহে। আপনারা শুনিয়া তাজ্জব হইয়া যাইবেন যে, শরীয়তের ফতোয়া অনুসারে বাণিজ্য ও কৃষিকাজ ফরযে কেফায়া। কারণ এইগুলির উপরে মানুষের বাঁচিয়া থাকা নির্ভর করে। আর ফরযে কেফায়া উহাকে বলে যাহা কিছু লোকে আদায় করিলে তাহাতে অন্যদের ফরযও আদায় হইয়া যায়। সুতরাং একথা বলা ভুল যে, মৌলবীরা সম্পদ অর্জন করিতে নিষেধ করে। ফরযে কেফায়া আদায় করিতে কেহ কাহাকেও নিষেধ করিতে পারে কি? (খায়রুল মালে লিররেজাল)

আল্লাহ বলেন ঃ

وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُوْلِهٖ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ 'ইজ্জত শুধুমাত্র আল্লাহ, রাসূল ও মুমিনদের জন্য।' এই আয়াতের উপরে যাহার বিশ্বাস আছে সে কি কাহাকেও ইজ্জত অর্জন করিতে বাধা দিতে পারে? মৌলবীরা ইজ্জত অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কেই শুধু আপত্তি করিয়া থাকে। কারণ কলিকাতার টিকেট করিয়া উহা দ্বারা পেশোয়ার যাওয়া যায় না। ইজ্জত অর্জনের সঠিক পদ্ধতি উহাই যাহা আল্লাহ এবং রাসূল (সঃ) বলিয়া দিয়াছেন। প্রথমে জানা আবশ্যক, মান-সন্মান অর্জনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা কি? মানুষ মান-মর্যাদা কামনা করে শুধু বড় হইবার জন্য। প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষ যাহা কিছু করে তাহা দুইটি উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে– ক্ষতি হইতে বাঁচা ও উপকার লাভ। আর এই দুইটি বস্তুই মানুষের জন্য জরুরী। আর এই জন্যই ধন ও মান অর্জন করা জরুরী। ক্ষতি নিবারণের জন্য মান এবং উপকার লাভের জন্য ধন অর্জন করা প্রয়োজন।

সুতরাং ধন ও মান তো অর্জন করিতেই হইবে। কিন্তু তাহা করিতে হইবে শরীয়ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে। যাহারা ধন-মান অর্জনের নিন্দা করেন তাহাদের নিন্দার উদ্দেশ্য হইল ধন ও মানের প্রতি ভালোবাসার নিন্দা করা। বিশেষতঃ যদি উহা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার চেয়েও প্রবল হয়। যদ্দরুন মানুষ আল্লাহর নির্দেশকেও অমান্য করিতে দ্বিধাবোধ করে না।

ধন লিপ্সার প্রকৃত ক্ষেত্র

হযরত ওমর (রাঃ)-এর যুগে কোনও এক যুদ্ধে প্রচুর সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়। ইহাতে হযরত ওমর (রাঃ) আল্লাহর কাছে দোয়া করিলেন, হে প্রভু! আপনি বলিয়াছেনঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

অর্থাৎ "নারী, সন্তান ও অঢেল সোনা রূপার প্রতি ভালোবাসাকে মানুষের জন্য আকর্ষণীয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে।" হে প্রভু! যখন আপনি নিজেই কোন অন্তর্নিহিত কারণে এইগুলিকে আমাদের জন্য আকর্ষণীয় করিয়া দিয়াছেন তখন আমাদের অন্তরে যেন এইগুলির প্রতি কোন আকর্ষণই না থাকে এমন দোয়া করা বেয়াদবি হইবে। সুতরাং এমন দোয়া আমি করিতে পারি না। তাই আমি এই প্রার্থনাই করিতেছি যে, এই ভালোবাসাকে আপনি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বানাইয়া দিন।

প্রগতির উদ্দেশ্য কল্যাণ না অকল্যাণ?

প্রগতি কল্যাণকর কাজেও হয় আবার অকল্যাণকর কাজেও হয়। ভালো কাজে প্রগতি চেষ্টা সাধনা করিয়া অর্জন করিবার জিনিস, মন্দ কাজে নহে। নতুবা

চোর, ডাকাত, প্রতারক এবং পকেট মাররাও তো বলিতে পারে যে, আমরা আমাদের কাজে উন্নতি করিতে চাই, তোমরা ইহাতে বাধা দিবে কেন? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভালো কাজে উন্নতি কাম্য আর খারাপ কাজে উন্নতি অবাঞ্ছিত। এখন বিচার্য এই যে, মানুষ যাহাকে উন্নতি বলিয়া থাকে তাহাই যে ভালো পদ্ধতি তাহা আগে প্রমাণ করিতে হইবে। আর আমরা মৌলবীরা যাহাকে প্রগতি বলি উক্ত পদ্ধতি যে উত্তম তাহা আমরা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া দিব। প্রগতি ভালো জিনিস। কিন্তু উহার ভ্রান্ত পদ্ধতি উহাকে খারাপ কাজের প্রগতি বানাইয়া দেয়।

প্রগতির হাকীকত

আজকাল প্রগতি বলিতে যাহা বুঝানো হয় উহা আসলে স্বার্থপরতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার নামান্তর। শরীয়তের কথা বাদ দিলেও এগুলি তো এমনিতেই নিন্দনীয়। এইগুলিকে প্রগতির মতো একটি সুন্দর নাম দিলেই কি উহা ভালো হইয়া যাইবে? প্রগতির হাকীকত কি তাহা সর্বাগ্রে জানা প্রয়োজন। প্রগতির হাকীকত উহাই যাহার অনুমতি শরীয়ত দিয়াছে অর্থাৎ হালাল পথে অগ্রসর হওয়া। অর্থাৎ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন বা প্রগতি যাহাই বলি না কেন শরীয়ত উহার একটি সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। প্রগতির নামে শরীয়তের সীমা লংঘন করা যাইতে পারে না। সুতরাং শরীয়ত অননুমোদিত যাবতীয় পন্থা ও পদ্ধতি আমাদিগকে বর্জন করিয়া চলিতে হইবে। অনেকে এখানে প্রশ্ন তোলেন যে, শরীয়ত আমাদের জীবনযাত্রাকে সীমিত করিয়া দিয়াছে। আমি তাহাদিগকে বলিতে চাহি যে, পৃথিবীর সব দেশেই জনগণের জীবনযাত্রার একটি সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কোন দেশেই স্বাধীনতার নামে বল্গাহীন জীবনযাত্রার বা যাহা খুশী তাহাই করার অনুমতি দেওয়া হয় না। কোন সরকার কি এই অনুমতি দিবে যে, আপনি চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি বা লুটপাট করিয়া যেভাবে পারেন নিজের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করুন? নিশ্চয়ই না। সরকার কর্তৃক আরোপিত সীমা মানিয়া চলিতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। আর যত আপত্তি শুধু আল্লাহ কর্তৃক আরোপিত প্রগতির সীমা মানিয়া চলিতে? (আহকামুল জাহ)

ইসলামী প্রগতি ও আধুনিক প্রগতি

আধুনিক প্রগতির সার কথা হইল (সম্পদের ও নামের) লোভ। আর শরীয়ত লোভের মূলোৎপাটন করিয়াছে। মহানবী (সঃ) এবং সাহাবাগণের জীবনে লোভের লেশমাত্রও ছিল না। তাহারা যে উন্নতি করিয়াছিলেন তাহা ছিল দ্বীনের উন্নতি। যদিও তাহারা এমন পার্থিব উন্নতিও সাধন করিয়াছিলেন যাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। কিন্তু তাহাদের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল দ্বীনের উন্নতি। যেমন আল্লাহ তাহাদের সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ

اَلَّذِیْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِی الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ....

অর্থাৎ "ইহাদিগকে ক্ষমতা প্রদান করিলে ইহারা নামায প্রতিষ্ঠা করিবে। যাকাত প্রদান করিবে এবং মানুষকে সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্য হইতে নিষেধ করিবে।" ইহাই ছিল তাহাদের প্রগতি। (তেজারতে আখেরাত, পৃষ্ঠা ঃ ২-৪)

অপরাপর জাতির সম্পদ দেখিয়া মুসলমানদের জিহ্বায় পানি আসিয়া যায়। কিন্তু তাহারা জানে না যে, দুনিয়া কম অর্জিত হওয়ার মধ্যেই রহিয়াছে আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তা। বেশী সম্পদের মালিক হইলে আমরা সর্বদা এই চিন্তাতেই মগ্ন থাকিতাম এবং আখেরাতকে ভুলিয়া যাইতাম। কেহ যদি বলে যে, সম্পদ বেশী হইলে আমরা উহা আল্লাহর পথে বেশী করিয়া ব্যয় করিব এবং বেশী বেশী নেক আমল করিব তবে আমি তাহাকে বলিতে চাই যে, আজ আপনার মধ্যে যে চিন্তাধারা বিদ্যমান বেশী সম্পদের মালিক হইলে আপনার মনে ঐ চিন্তাধারা থাকিবে কি-না তাহা আপনি নিজেও জানেন না। কিন্তু আল্লাহ বিলক্ষণ জানেন।

সাহাবাদের চেয়েও বেশী খাঁটি নিয়ত আর কাহাদের হইবে? অথচ হাদীসে আছে, মহানবী (সঃ) একবার সাহাবাদিগকে বলিলেন, আমার তিরোধানের পর তোমরা অনেক সাম্রাজ্য জয় করিবে এবং প্রচুর ধন-সম্পদ ও দাসদাসীর মালিক হইবে। তখন তোমাদের অবস্থা কি হইবে? সাহাবাগণ বলিলেন, তখন আমরা দুঃখ-কষ্ট হইতে মুক্তি পাইব এবং নিশ্চিন্তভাবে আল্লাহর ইবাদত করিব। মহানবী (সঃ) বলিলেন, তোমাদের বর্তমান অবস্থাই উত্তম। সাহাবাগণ বেশী সম্পদ লাভ করিয়া দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকেন নাই। বরং পূর্বের চেয়ে আরও বেশী করিয়া আল্লাহর ইবাদত করিয়াছেন। তথাপি মহানবী (সঃ) তাহাদের জন্য বেশী সম্পদ পছন্দ করে নাই। সুতরাং আমাদের জন্যও তিনি নিশ্চয়ই বেশী সম্পদ পছন্দ করিবেন না। তাই অপরাপর জাতির বেশী সম্পদ দেখিয়া আমাদের লোভাতুর হওয়া অনুচিত। হাদীসে আছেঃ

اُولٰٓئِكَ عَجِّلَتْ طَيِّبَاتُهُمْ فِیْ حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا

(উহাদিগকে উহাদের ভোগ-সম্পদ দুনিয়াতেই দিয়া দেওয়া হইয়াছে)। আর আখেরাতে তাহাদের জন্য আযাব ছাড়া আর কিছুই নাই। (মাজাহেরুল আহওয়াল, পৃষ্ঠা ঃ ১৮)

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইবে ইসলামের প্রসার

লোকে বলে মৌলবীরা রাজনীতির কি বুঝে? শুধু জায়েয ও নাজায়েয নিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যেভাবেই হউক দেশের উন্নতি করিতে হইবে। ইহারা জানে না যে, ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যই হইল 'মোল্লাগিরি'র প্রসার। অর্থাৎ যাহারা

ঈমানের সম্পদ হইতে বঞ্চিত তাহাদিগকে ঈমানের দৌলত দান করিতে হইবে অথবা তাহাদিগকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে রাখিতে হইবে। যেন তাহারা ঈমান ও শরীয়তের নূর প্রত্যক্ষ করিয়া ঈমান আনার সুযোগ পায়। আল্লাহ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দ্বারা সাহাবাদের জন্যও এই 'মোল্লাগিরি'ই পছন্দ করিয়াছেন। আল্লাহ বলেনঃ

اَلَّذِیْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِی الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ....

অর্থাৎ "ইহারা ক্ষমতার মালিক হইলে নামায প্রতিষ্ঠা করিবে, যাকাত প্রদান করিবে এবং মানুষকে সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্য হইতে নিষেধ করিবে।" (এলাজুল হিরস, পৃষ্ঠা ঃ ১৭)

মাল, ইজ্জত ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির দ্বারা আমাদের আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দ্বীনের উন্নতি। আমাদের পূর্বপুরুষদের তরিকাও ছিল ইহাই। দ্বীনের উন্নতি উদ্দেশ্য হইলে এই ত্রিবিধ উন্নতি আপনা আপনিই সাধিত হইবে। যদি শরীয়তের আওতায় থাকিয়া এই ত্রিবিধ উন্নতি সাধন করা হয় তবে উহা হইবে কল্যাণের প্রগতি নতুবা তাহা হইবে অকল্যাণের প্রগতি। মানুষ লোভকেই প্রগতি বলিয়া থাকে। ফলে লোভ দোষ বলিয়া বিবেচিত হয় না এবং উহার সংশোধনও সম্ভব হয় না। (তাসহিল)

আমাদের দ্বীনের অবনতির কারণ যদি আমাদের আর্থিক দৈন্যের কারণে হইয়া থাকে তাহা হইলে তো বিত্তশালীদের মধ্যে দ্বীন আরও বেশী হওয়া উচিত। আপনি নিজেই বিচার করুন, ধনীদের মধ্যে দ্বীন বেশী না গরিবদের মধ্যে? আসল কথা হইল যে, যদি অন্তর ঠিক থাকে তবে অর্থ-সম্পদ থাকা না থাকা কোনটাই ক্ষতিকর নহে। অন্তর ঠিক না থাকিলে অর্থ-সম্পদ না থাকা কম ক্ষতিকর এবং থাকা বেশী ক্ষতিকর। (দ্বীন ও দুনিয়া, পৃষ্ঠা ঃ ৭৩০)

আমি খুব কম লোককেই অবসর পাইতে দেখিয়াছি। কিন্তু এইটুকু অবসরেও মানুষ আল্লাহর নাম নিতে চায় না। সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে আল্লাহ হইতে গাফিলতি, বেপরোয়া ভাব, গরিবদের তুচ্ছ জ্ঞান করা ও নিষ্ঠুরতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। (আল ইমতেহান, পৃষ্ঠা ঃ ৪)

যুগ পরিবর্তনের হাকীকত

লোকে বলে, যুগ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তোমরাও বদলাইয়া যাও। কবি বলিয়াছেনঃ

ع- زمانه با تو نسازد تو بزمانه بساز

আর আমি বলি ঃ ع- زمانه با تو نسازد تو بزمانه مساز

জামানা বদলাইবে কি? প্রকৃতপক্ষে জামানা আমাদের অধীন। আমরা জামানাকে বদলাইয়া দেই। জামানা আমাদিগকে কি বদলাইবে? আমরা যখন নিজদিগকে বদলাইয়া ফেলি তখন জামানাও বদলাইয়া যায়। জামানা কি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু? আমরা যখন জামানাকে বদলাইতে পারি তখন উহার হেফাজতও করিতে পারি। আকবর হোসেন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলিতেন, জামানা নিজে নিজে বদলায় না। তোমরা বদলাইয়া যাও তাই জামানাও বদলাইয়া যায়। তোমাদের পরিবর্তনই যুগের পরিবর্তন। যুগ তো তোমরাই। সত্যি আমরা না বদলাইলে জামানা বদলায় না। জামানার হাকীকত তো আমরাই। (মলফুজাত, ৭ম খণ্ড, মলফুজ ঃ ৬১)

মুসলমানদের প্রগতির মাপকাঠি

এক মৌলবী সাহেব আরজ করিলেন, হযরত! আজকাল সবকিছু বিগড়াইয়া গিয়াছে। আলেম সমাজও ভুল মাসআলা বলিয়া থাকেন। ইহার জবাবে হযরত মাওলানা বলেন, হাঁ লাগামহীন হইলে তাহাদের দশা এমনই হয়। ইহারা শরীয়তের বিধানকে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার বানাইয়া লয়। অন্তরে আল্লাহর ভয় না থাকিলে মানুষ এই পর্যায়ে গিয়া পৌঁছে। আজকাল মানুষকে দ্বীনের কথা বুঝাইতে গেলে তাহারা বলিয়া বসে, তোমরা তো আগের জামানার মানুষ। সেই দিন কি আর আছে নাকি? এখন তো প্রগতির যুগ। আমি তাহাদিগকে বলিতে চাই, জমিন, আসমান, চাঁদ, সূর্য এগুলিও তো পুরানো। এগুলিকে বাদ দাও না কেন? তাহারা বলে, ইহা নাকি প্রগতির যুগ। তাহা হইলে সালফে সালেহীন হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত কি অবনতির যুগ ছিল? এই মূর্খরা বুঝিতে চায় না যে, ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদাই যদি প্রগতির মাপকাঠি হইত তবে তো বলিতে হয় যে, শাদ্দাদ, নমরুদ, ফেরাউন, হামান ও কারুন প্রভৃতি কাফেররা নবীদের চেয়েও বেশী প্রগতিশীল ছিল।

মুসলমানদের প্রগতির মাপকাঠি হইতেছে দ্বীন। যদি দ্বীন ঠিক থাকে এবং আল্লাহ খুশী থাকেন তবে উহাই মুসলমানদের প্রগতি। আর যদি দ্বীন ঠিক না থাকে এবং আল্লাহ অসন্তুষ্ট থাকেন তবে উহাই অবনতি। দ্বীনের সঙ্গে সঙ্গে যদি দুনিয়াও অর্জিত হয় তবে আর কে উহাতে বাধা দেয়? বরং উহাতে তো দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে আরও সুবিধা হইবে এবং সে ক্ষেত্রে দুনিয়া আর দুনিয়া থাকিবে না উহাও হইবে দ্বীন। (আল ইফাজাত, মলফুজ ঃ ১০০)

মুসলমানকে মুসলমান হইতে হইবে। তাহার পর সে রাজা হউক, বাদশাহ হউক তাহাতে আর আপত্তি কাহার? আল্লাহর নাফরমান না হইলেই হইল। কিন্তু লোকে মনে করে যে, মৌলবীরা মানুষকে অবনতির পথই দেখায়। (আল ইফাজাত, মফলুজ ঃ ৩৭৮)

সম্পদের সাথে সাথে যদি দ্বীনের পুরামাত্রায় হেফাজত হয় তাহা হইলে তোমাদিগকে পার্থিব উন্নতি করিতে কে বাধা দেয়? যত খুশী উন্নতি করিতে পার। রাজা হও, উজির হও, সারা দুনিয়া জয় করিয়া লও, কিন্তু সীমার মধ্যে থাকিও। (আল জাবরু বিস সবরে, পৃষ্ঠা ঃ ৪৩)

যাহার অন্তরে থাকে আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর প্রতি ভালোবাসা আর হাতে থাকে মাল ও দৌলত সে ব্যক্তি দুনিয়াদার নহে। আর উহার পরিচয় এই যে, যদি দ্বীনের ক্ষতি করিয়া লাখ টাকাও পাওয়া যায় তবে সে ঐ লাখ টাকাকে লাথি মারিবে। (আল হায়াত, পৃষ্ঠা ঃ ২৮)

আজকাল অনেকে দুনিয়াকে দ্বীনের উপরে অগ্রাধিকার দিয়া দুনিয়া অর্জন করিতে চায়। ইহা গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই নহে। দ্বীনকে অগ্রাধিকার দিয়া শরীয়তের সীমার মধ্যে থাকিয়া দুনিয়া অর্জনের চেষ্টা করিলে সাফল্য অচিরেই অর্জিত হইবে। (আল ইফাজাত, মলফুজ ঃ ৪৫৬)

সুদকে হালাল জানিলেই প্রগতি হয় না

মানুষ আজকাল হারামকে হারাম বলিয়া মনে করিতে চাহে না। কিছু লোক তো এমনও ভাবে যে, সুদকে হালাল করিতে পারিলে তাহাতে মুসলমানদের উন্নতি হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করি, সুদকে হালাল করিতে পারিলে তাহাতে মুসলমানদের কল্যাণ হইবে আপনাদের কাছে এমন কোন প্রমাণ আছে কি? যদি না থাকে তবে এমন চিন্তা করিয়া কি লাভ? সুদ যদি খাইতেই চাও তবে উহাকে পাপ মনে করিয়াই খাইও। (আল আকেলাতুল গাফেলাত)

মূল্যবান উপদেশ

আপনারা যদি নিজদিগকে পূর্ণমাত্রায় সংশোধন করিতে নাও পারেন তবে অন্ততঃপক্ষে দুইটি কথা মানিয়া চলিবেন। (১) খাঁটি আকিদা পোষণ করিবেন। (২) আপনারা যে সকল নাজায়েয কাজ করেন ঐগুলিকে হারাম জানিয়াই করিবেন। টানাটানি করিয়া ঐগুলিকে জায়েয করিবার চেষ্টা করিবেন না। কারণ আপনাদের অপব্যাখ্যায় হারাম কাজ তো আর হালাল হইতে পারে না। কিন্তু ইহাতে ক্ষতি হইবে এই যে, তখন আপনারা হারামকে হালাল বলিয়া বিশ্বাস করিবেন। আর হারামকে হালাল বলিয়া বিশ্বাস করা কুফরী কাজ। যদি আপনারা হারাম কাজকে হারাম জানিয়াই করেন তবে তাহাতে পাপ হইবে ঠিকই কিন্তু কুফরী বর্তাইবে না। আর হারামকে হারাম জানিলে কোন সময় উহা হইতে তাওবা করার তওফিকও হইতে পারে। আর যদি তাওবার তওফিক না হয় এবং সারা জীবন ঐ হারাম কাজেই লিপ্ত থাকেন তবুও কুফরীর হাত হইতে তো বাঁচিয়া যাইবেন। (এলেম ও আমল, পৃষ্ঠা ঃ ১২৭)

প্রগতি সম্পর্কে কতিপয় ভুল ধারণা

অপরাপর জাতির প্রগতির রহস্য জানিবার জন্য আমাদের নেতারা অনেক চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, উহাদের উন্নতির মূলে রহিয়াছে সুদপ্রথা। কিন্তু এই ধারণা ভুল। কারণ সুদ যদি উন্নতির সোপান হইত তবে মুসলমানদের মধ্যে যাহারা সুদখোর তাহারাও উন্নতি করিত। কিন্তু অপরাপর জাতির তুলনায় ইহারা তেমন করিতে পারে নাই।

অনেকে মনে করেন যে, যেহেতু শরীয়তে ব্যবসা বাণিজ্যের কতক পদ্ধতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে তাই মুসলমানরা উন্নতি করিতে পারিতেছে না। এই ধারণাও ভ্রান্ততা প্রসূত। কারণ ব্যবসা বাণিজ্যে শরীয়ত কর্তৃক আরোপিত বিধি-নিষেধ দুই চারিজন ছাড়া আর কেহ মানিয়া চলে না। তাহা সত্ত্বেও তাহাদের উন্নতি হয় না কেন?

অনেকের ধারণা, পর্দা প্রগতির অন্তরায়! যদি পর্দা তুলিয়া দেওয়া যায় এবং নারীরা স্বাধীনভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করিতে পারে তবে তাহারা নিজেরাও উন্নত হইবে এবং তাহাদের সন্তানদিগকেও উন্নত জীবনধারা শিক্ষা দিতে পারিবে। ইহাও ভুল ধারণা বৈ নহে। কারণ মুসলমানদের মধ্যেও কোন কোন সম্প্রদায়ের নারীরা পর্দা মানে না আর তাহা ছাড়া দরিদ্রদের মধ্যে তো কোন কালেই পর্দার রেওয়াজ নাই। যদি পর্দা বর্জন করিলেই উন্নতি করা যায় তবে ইহাদের উন্নতি হয় না কেন? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অপরাপর জাতির উন্নতির কারণ এইগুলি নহে, অন্য কিছু। (আল ইবরা, পৃষ্ঠা ঃ ৪৫)

অমুসলিমদের প্রগতির রহস্য কি?

অপরাপর জাতির উন্নতির কারণ এমন কিছু গুণাবলী যাহা তাহারা আমাদের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছে। যেমন শৃংখলা, অধ্যবসায়, সময়ানুবর্তিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, পরিমাণদর্শিতা ও পারস্পরিক ঐক্য ইত্যাদি। ইসলামই এইগুলি শিক্ষা দিয়াছে। আর এই সকল গুণাবলী গ্রহণ করিলে মানুষ উন্নতি লাভ করে এবং এইগুলি বর্জন করিলে উন্নত জাতিরও পতন আসে। এখন যাহার ইচ্ছা এইগুলি গ্রহণ করুক আর যাহার ইচ্ছা ত্যাগ করুক। (আল ইবরা বেজাবহিল বাকারা)

ইসলামী মূলনীতির উপকারিতা

ইসলামী মূলনীতির উপকারিতার উদাহরণ কাশি নিবারণের ক্ষেত্রে গুলে বানাফ্‌শারা (ইহা এক প্রকারের ফুল) উপকারিতার ন্যায়। মুসলমান হউক বা কাফের হউক যেই ইহার রস পান করিবে তাহারই কাশি নিবারিত হইবে। এইভাবে যে ব্যক্তি সঠিক মূলনীতির অনুসরণ করিবে সে মুসলমান হউক বা

কাফের হউক উন্নতি লাভ করিবে। উদাহরণ স্বরূপ আরও বলা যায়, রাজপথ দিয়া যে চলিবে গাছের ছায়ায় ছায়ায় শান্তিতে চলিতে পারিবে তা সে মুসলমান হউক বা কাফের হউক, শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান বা মুচি মেথর যাহাই হউক না কেন। তবে আখেরাতের শান্তি পাইতে হইলে তজ্জন্য ঈমান আনা শর্ত।

অন্য জাতির পন্থাসমূহ মুসলমানদের জন্য কল্যাণের নহে

ইউরোপীয় ও অন্যান্য জাতি প্রগতির যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে ঐগুলি দ্বারা কোন পার্থিব সাফল্য যে অর্জিত হয় না তাহা নহে। কিন্তু ঐগুলিতে মুসলমানদের কোন লাভ নাই। কারণ ঐগুলি পাপজনক বলিয়া আমরা উহা গ্রহণ করিতে পারি না। তবে কাফেরদের জন্য ঐ সকল পদ্ধতি গ্রহণ করিতে কোন বাধা নাই। কারণ ঈমান না আনা পর্যন্ত তাহারা শরীয়তের খুটি-নাটি হুকুম আহকাম মানিয়া চলিতে বাধ্য নহে। তাহারা ঈমান আনিতে বাধ্য। আর ঈমান না আনার দরুন তাহাদের সর্বোচ্চ শাস্তি হইবে। অন্যান্য আমলের জন্য তাহারা কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হইবে না।

আমরা যদি আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কোন পদ্ধতি গ্রহণ করি তবে উহাতে আমাদের সফলতা অর্জিত হইবে না। আল্লাহর হুকুমের বরখেলাফ চলার শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা ঐ পদ্ধতিসমূহের উপকারিতা বিলুপ্ত করিয়া দিবেন। আর তাহা ছাড়া প্রত্যেক জাতির প্রগতির ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি রহিয়াছে। তাই এক জাতির জন্য যে পদ্ধতি কল্যাণকর অপর জাতির জন্য তাহা কল্যাণকর নাও হইতে পারে। আর যদি ধরিয়াও লওয়া হয় যে, অপরাপর জাতির উন্নতির ও সাফল্যের পদ্ধতিগুলি আমাদের জন্যও কল্যাণকর, তবুও আল্লাহর বিধান লংঘন করিয়া আমরা উহা গ্রহণ করিতে পারি না।

মদ, জুয়া, সুদের মধ্যেও উপকারিতা আছে। আল্লাহ নিজেই বলেনঃ

قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

অর্থাৎ "আপনি বলিয়া দিন যে, মদ ও জুয়া গুরুতর অপরাধ এবং ঐগুলিতে কিছু কিছু উপকারিতাও নিহিত আছে।" যে উপকারিতায় আল্লাহর গজব রহিয়াছে তাহা কি আমরা গ্রহণ করিতে পারি? মানুষের চিন্তাধারা এমনই যে, নিজেরা চলিবে শরীয়তের বিপরীত এবং এই আশাও করিবে যে, মৌলবীরা তাহাদের কাজকর্ম সমর্থন করুক। (আল মোরাবাতা, পৃষ্ঠা ঃ ৪৮)

'দুনিয়াকেও ভালোবাসার প্রয়োজন আছে'– একথা যাহারা বলে তাহারা স্যার সৈয়দ আহমদের চেলা চামুণ্ডা। ঐ বেটা তো এই গান গাহিতে গাহিতে মরিয়াছে আর এবারে তাহার চেলাদের পালা। ইহাদের 'প্রগতি' 'প্রগতি' শুনিতে শুনিতে কান ঝালাপালা হইয়া গেল। কিন্তু উহারা যে কি চায় তাহা আজও বুঝিলাম না।

ইহারাই কোরআন হাদীসকে অস্বীকার করে। তবে সরাসরি নহে, অনেক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এবং বুদ্ধি খাটাইয়া। আর মজার কথা এই যে, প্রগতির নামে মানুষ যত শরীয়ত বহির্গত পদ্ধতি গ্রহণ করিতেছে, দিন দিন মুসলমানদের অবস্থার ততই অবনতি হইতে দেখিতেছি।

আধুনিক শিক্ষা ও শরীয়ত বিগর্হিত প্রগতি

আজকাল সর্বত্রই ধন ও মান অর্জনের প্রতিযোগিতা দেখিতে পাই। আর এই জন্য মানুষ যে যার মতো কিছু পদ্ধতিও আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে। এই পদ্ধতিগুলি হারাম না হালাল তাহা নিয়া কাহারও কোন মাথা ব্যথা নাই। অধিকাংশ মানুষের চিন্তাধারা এই যে, ধন ও মানই হইতেছে আসল বস্তু। ইহারই নাম প্রগতি। ইহা অর্জনের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, তা সে চেষ্টা শরীয়ত অনুযায়ী হউক বা শরীয়ত বিরোধী হউক। ধন উপার্জনের যে সকল পদ্ধতি এখন প্রচলিত ঐগুলির বদৌলতে মানুষ ক্রমেই শরীয়ত হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। যেমন মানুষ মনে করে যে, আধুনিক শিক্ষা পূর্ণমাত্রায় অর্জন করিতে হইবে এবং ইহাতে বড় বড় ডিগ্রী অর্জন করিতে হইবে। ইহার পরিণতি যত বিষময় হউক না কেন। আজকাল মানুষকে বলিতে শোনা যায় যে, মৌলবীরা মানুষকে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধা দেয়। আমি বলিতে চাই, আধুনিক শিক্ষার যে সকল প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আমরা সচরাচর দেখিতে পাই ঐগুলি না হইলে আমরা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে কাহাকেও বাধা দিতাম না। কিন্তু আমরা সচরাচর যাহা দেখি তাহা এই যে, দুই চারিজন ব্যতিক্রম বাদে আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে না আছে নামায-রোযা আর না আছে শরীয়তের অন্যবিধ হুকুম আহকামের পাবন্দী।

অনেকে তো বলিয়াই ফেলে যে, এখন হালাল হারাম দেখার সময় নহে। যে যেভাবে পার টাকা কামাইয়া লও। মুসলমান যদি এমন কথা বলিতে পারে তাহা হইলে সেই শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধা দিলে মৌলবীদের দোষ কোথায়? এমনিভাবে মান-সম্মান অর্জনের বেলায়ও উহার পদ্ধতি হালাল না হারাম মানুষ তাহার বাছ-বিচার করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ এ ব্যাপারেও শরীয়ত বিগর্হিত পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, মান-মর্যাদা দ্বারা মানুষ অসৎ উদ্দেশ্যই সাধন করিয়া থাকে। কখনও বা ইহাকে শোষণ ও নিপীড়নের হাতিয়ার বানাইয়া লয় এবং ইহাকেও বাহাদুরী বলিয়া মনে করে। (ফজলুল এলমে ওয়াল আমল)

ইসলামী প্রগতির হাকীকত

ধন ও মানের উন্নতিকে অনেকে ইসলামের উন্নতি মনে করিয়া থাকে। উহাদের জানা উচিত, ধন ও মানের নাম ইসলাম নহে। ইসলাম কি জিনিস

মহানবী (সঃ) তাহা ব্যাখ্যা করিতে বাদ রাখেন নাই। আল্লাহ একবার জীবরাঈল (আঃ)-কে মানুষের বেশে মহানবী (সঃ)-এর কাছে পাঠাইলেন। জীবরাঈল (আঃ) এক ভরা মজলিসে মহানবী (সঃ)-এর নিকট আগমন করিলেন এবং মানুষকে শোনাইবার জন্য মহানবী (সঃ)-কে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল, ইসলাম কি জিনিস? উহার জবাবে মহানবী (সঃ) বলিলেনঃ ইসলাম হইতেছে এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহই একমাত্র উপাস্য এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাহার রাসূল এবং নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত আদায় করা।

এই হাদীস দ্বারা ইসলামের হাকীকত জানা গেল। সুতরাং ইসলামের উন্নতির অর্থ হাদীসে বর্ণিত হুকুমগুলি পালনের উন্নতি অর্থাৎ নামায-রোযার উন্নতি। সুউচ্চ অট্টালিকা, ট্রাম লাইন ইত্যাদির উন্নতি ইসলামের উন্নতি নহে।

মহানবীই (সঃ) যখন ইসলামের ব্যাখ্যা দিয়া গিয়াছেন তখন বড় বড় পদলাভ ও ধন-মানের উন্নতিকে ইসলামের উন্নতি বলিবার সাহস কাহার আছে? মুসলমানরা যদি তাহাদের দ্বীনকে পূর্ণভাবে পালন করিয়া চলে তবুও তাহাদের পার্থিব উন্নতিকে ইসলামের উন্নতি বলা যাইবে না। উহাকে মুসলমানদের উন্নতি বলা যাইবে। আর মুসলমানগণ যখন দ্বীনকে ত্যাগ করিয়াছে তখন তাহাদের পার্থিব উন্নতিকে মুসলমানদের উন্নতি বলা যায় না। ইহাকে কুফরীর উন্নতি বলিতে হইবে। (এলম ও আমল, পৃষ্ঠা ঃ ৫৫৬)

প্রগতির ভিত্তি হইতেছে ইসলামী শিক্ষা

মুসলমানগণকে উন্নতি করিতে হইলে শরীয়তের পাবন্দী করিয়াই তাহা করিতে হইবে। অনেকে প্রশ্ন করে, প্রগতির সহিত ধার্মিক হওয়ার কি সম্পর্ক? প্রগতির জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক পরিকল্পনা। ইহা পাশ্চত্য ধ্যান-ধারণা প্রসূত বাতিল চিন্তাধারা বৈ আর কিছুই নহে। প্রকৃত সত্য এই যে, মুসলমানরা পূর্ণভাবে শরীয়তের পাবন্দ না হইলে শুধু রাজনৈতিক পথে তাহাদের উন্নতি আসিবে না। কারণ শরীয়তের হুকুম আহকামের পাবন্দীর ফল হইতেছে দ্বিবিধি। (১) আল্লাহর প্রিয় হওয়া, (২) পার্থিব উন্নতি। আল্লাহর প্রিয় হওয়ার জন্য ইসলাম শর্ত। যাহা মুসলমান ব্যতীত অপর কোন জাতির কাছে নাই। আর পার্থিব উন্নতির জন্য ইসলামী আখলাক অনুসরণ করা প্রয়োজন। মুমিন হউক বা কাফের হাউক যে-ই ইসলামী আখলাক অনুসরণ করিবে সেই পার্থিব উন্নতি লাভ করিবে।

পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত জাতি উন্নতি করিয়াছে তাহারা ইসলামী শিক্ষাকে গ্রহণ করিয়াই তাহা করিয়াছে। সততা, ন্যায় বিচার, সহজ ও অনাড়ম্বর জীবন, মিতব্যয়িতা, জনসেবা, ঐক্য– এগুলি কাহার ঘরের সম্পদ? ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে কেহ কি এইসব গুণাবলীর সহিত পরিচিত ছিল? এগুলি মুসলমানদের ঘরের সম্পদ যাহা হইতে তাহারা দূরে সরিয়া রহিয়াছে। আর

বিজাতীয়রা এইগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। বর্তমানে মুসলমানরাই একমাত্র জাতি যাহাদের নিজস্ব বলিতে এখন কিছুই নাই।

মুসলমানদের প্রগতির সঠিক ও পরীক্ষিত পদ্ধতি

শরীয়তকে বিসর্জন দিয়া যদি মুসলমানরা উন্নতি করে তবে উহাকে ইসলাম বা মুসলমানদের উন্নতি বলা যাইবে না। শরীয়ত নির্দেশিত পথে চলিতে এত দ্বিধা কেন? অন্ততঃ পরীক্ষামূলকভাবেও তো ইসলামী বিধানগুলি পালন করিয়া দেখা উচিত যে, উহাতে আমাদের উন্নতি হয় কি-না? আর ইহাতে আর যাহাই হউক কোন ক্ষতির আশংকা তো নাই। বিজাতীয়দের গোলামী তোমরা অনেক করিয়াছ, এবার অন্ততঃ পরীক্ষামূলকভাবে হইলেও আল্লাহর গোলামী করিয়া দেখ না! (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ১২৭)

অতীত যুগের মুসলমানরা কিরূপে উন্নতি করিয়াছেন উহাই দেখা আমাদের কর্তব্য। কাফেররা কিরূপে উন্নতি করিয়াছে তাহা আমাদের দেখিবার প্রয়োজন নাই। কারণ প্রত্যেক জাতিরই মেজাজ আলাদা। তাই এক জাতির জন্য যে পদ্ধতি উপকারী অন্য জাতির জন্য তাহা উপকারী নাও হইতে পারে। এমনিভাবে ব্যক্তিগতভাবে একজনের জন্য যে পদ্ধতি উপযোগী তাহা অন্যের জন্য উপযোগী নাও হইতে পারে।

মুসলমানদের উপমা মাথার টুপির ন্যায়। উহাতে সামান্য নাপাকি লাগিলে তৎক্ষণাৎ উহা খুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু জুতায় নাপাকি লাগিলে তাহা ফেলিয়া দেওয়া হয় না। এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদিগকে পাপ পংকিল অবস্থায় দেখিতে চাহেন না। তাই তাহারা পাপে লিপ্ত হইলে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হয়। আর কাফেররা যত অপরাধই করুক উহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দেওয়া হয় না।

সাহাবাগণ যে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন তাহা শুধু দ্বীনকে অনুসরণের কারণেই সম্ভব হইয়াছিল। তাহাদের আখলাক ছিল কোরআন ও হাদীস ভিত্তিক। আর তাই তাহাদিগকে দেখিয়া অপরাপর জাতির লোকেরা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইত। তাহারা আল্লাহকে খুশী করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া শত্রুর মোকাবিলায় তাহারা আল্লাহর সাহায্য লাভ করিতেন। আমাদিগকে উন্নতি করিতে হইলে তাহাদের পথ ধরিতে হইবে। (কামালাতে আশরাফিয়া, পৃষ্ঠা ঃ ৭৭)

মুমিনের আসল সম্পদ

وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ "আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দিয়া থাকেন।" তিনি যাহাকে দেন, নিজ ইচ্ছা ও অনুগ্রহে দেন। কেহ উহাতে বাধা দিতে পারে না। মুমিনের আসল সম্পদ ইহাই। অর্থাৎ নেক আমল। নেক আমলের দ্বারা যে শান্তি লাভ হয় তাহা মালের দ্বারা হয় না। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ

অর্থাৎ মুমিন নেক আমলকারীকে আল্লাহ পৃথিবীতে পবিত্র অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ জীবন দান করিবেন। অন্যত্র ইহার বিপরীতকারী সম্বন্ধে বলেনঃ

وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى

অর্থাৎ "আমার স্মরণ হইতে যে মুখ ফিরাইয়া থাকিবে তাহার রুজি সংকীর্ণ হইবে এবং কেয়ামতের দিন আমি তাহাকে অন্ধ করিয়া তুলিব।" আল্লাহ হইতে গাফিলতির পরিণতি ইহাই। এখানেও বিপদ, আখেরাতেও বিপদ। আর বাস্তবেও দেখা যায় যে, যথেষ্ট ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াদারদের জীবন শান্তিময় হয় না। অনেক সময় তাহাদিগকে মৃত্যু কামনা করিতেও দেখা যায়। পক্ষান্তরে নেক আমল করিলে দুনিয়াতেও শান্তি এবং আখেরাতেও শান্তি। ইহাই মুমিনের আসল সম্পদ।

পার্থিব আসক্তির প্রতিকার

তাওবার হাকীকত এবং উহার অর্থ হইল আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হওয়া আর লোভের হাকীকত হইল দুনিয়ার প্রতি নিবিষ্ট হওয়া। এখন এই মনোনিবেশকে যদি অন্য দিকে ফিরাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে আর দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ থাকিবে না।

আল্লাহর সহিত প্রত্যেকের প্রকৃতিগত সম্পর্ক রহিয়াছে এবং তাহার প্রতি প্রত্যেকের প্রকৃতিগত আকর্ষণও রহিয়াছে। এমনকি কাফেরদেরও রহিয়াছে। কারণ মানুষ অন্যের প্রতি যেসব কারণে আকৃষ্ট হয় ঐগুলি হইতেছে সৌন্দর্য, দানশীলতা ও গুণগরিমা। এই কারণগুলি যাহার মধ্যে প্রবল থাকে তাহার প্রতি আকর্ষণও প্রবল হইয়া থাকে। এই কারণগুলি মূলতঃ আল্লাহর মধ্যেই বিদ্যমান এবং অন্যদের মধ্যে রহিয়াছে সাময়িকভাবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে,

ভালোবাসা ও আকর্ষণ মূলতঃ আল্লাহর প্রতিই হইয়া থাকে এবং অন্য কাহারও প্রতি আকর্ষণ এই কারণে হইয়া থাকে যে, তাহার মধ্যে আল্লাহর গুণাবলীর ছায়া রহিয়াছে।

আল্লাহর প্রতি মুতাওয়াজ্জাহ হইবার হাকীকত

অনেকে মনে করেন যে, আল্লাহর প্রতি মুতাওয়াজ্জাহ হওয়া নামায রোযা ও অনান্য শরীয়তের হুকুম আহকাম পালনের নাম। ইহারা জাহেরী আমলকেই যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন। ইহারা অন্তরের দ্বারা আল্লাহর প্রতি মুতাওয়াজ্জাহ হওয়াকে জরুরী বলিয়া মনে করেন না। ইহারা মনে করেন যে, আমরা সব কিছুই মানিয়া চলি তবুও পাপকার্যের প্রতি আমাদের আকর্ষণ হ্রাস পায় না কেন এবং আমাদের অন্তরে নূর পয়দা হয় না কেন?

আর একদল আছে যাহারা বিভ্রান্তিতে লিপ্ত। তাহারা মনে করে যে, আল্লাহর প্রতি মুতাওয়াজ্জাহ হওয়ার অর্থ অন্তর দ্বারা আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হওয়া। ইহারা যিকির ও মোরাকাবা লইয়া থাকে এবং নামায রোযা ইত্যাদি জাহেরী আমলকে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে। ইহারা যেহেতু জাহেরী আমল ছাড়িয়া দিয়া পাপে লিপ্ত তাই ইহাদের অন্তরেও নূর পয়দা হয় না।

আল্লাহর প্রতি মুতাওয়াজ্জাহ হওয়ার হাকীকত হইতেছে আল্লাহর প্রতি অন্তর হইতে মনোনিবেশ করা এবং উহার পদ্ধতি তাহাই যাহা শরীয়ত নির্দেশ করিয়াছে। অর্থাৎ জাহেরী আমলের পাবন্দ হইতে হইবে এবং অন্তরেও আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে। আর সর্ববিধ পাপকার্য বর্জন করিতে হইবে। ইহার পরে অবশ্যই অন্তরে নূর পয়দা হইবে। মওলানা রুমী বলেঃ

چشم بند و لب به بندو گوش بند * کرنه بینی نور حق برما بخند

দ্বিতীয় পাঠ
সম্পদ ব্যয়ের সীমা

সম্পদ আমাদের নহে, আল্লাহর

মানুষ নিজের ব্যয়ভার বাড়াইয়া দিলে তখন তাহার বৈধ আয়ে আর কুলাইতে চাহে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এই কারণেই মানুষ অবৈধ আয়ের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে। হাদীসে আছে, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিনে মানুষকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, সে তাহার যৌবন কি কাজে ব্যয় করিয়াছে এবং সম্পদ কিভাবে আয় ও কিভাবে ব্যয় করিয়াছে? ইহার কারণ এই যে, মাল আমাদের নহে, আল্লাহর। আপনি যদি চাকরের হাতে ধনভাণ্ডার অর্পণ করেন তাহা হইলে কি সে উহার মালিক হইয়া যায়? অনুরূপভাবে আল্লাহ আমাদিগকে সম্পদ দিয়াছেন এবং উহা কোন কাজে ব্যয় করা যাইবে এবং কোন কাজে ব্যয় করা যাইবে না তাহাও বাতলাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং যথেচ্ছা ব্যয় করিবার অধিকার আমাদের নাই। অনুরূপভাবে সীমাতিরিক্ত ব্যয়েরও অনুমতি নাই। সুতরাং ব্যয়কে শরীয়তের আইন মোতাবেক নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

ব্যয়ের সীমাও নির্ধারিত

বিবাহ শাদীতে মানুষ চোখ বুঁজিয়া খরচ করে। জানিয়া রাখ, আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। ঐ সীমাকে জানিতে হইবে। কেহ যদি নামায চারি রাকাতের স্থলে ছয় রাকাত পড়ে বা এশা পর্যন্ত রোযা থাকে তবে সে গোনাহগার হইবে। নামায রোযার যেরূপ সীমা আছে তদ্রূপ সম্পদ ব্যয়েরও সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। সীমাতিরিক্ত ব্যয় করিলে গোনাহগার হইতে হইবে।

মুসলমানরা ব্যয়ের সময় অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করে না। বেহিসাবী ব্যয় করিয়া পরে নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনে। ইসলামী নীতি মানিয়া চলিলে এমন বিপর্যয় ঘটিতে পারে না। (আহকামুল মাল, পৃষ্ঠা ঃ ৪৪-৬৮)

ভোগ-বিলাস ও অহংকারের পরিণাম লাঞ্ছনা

বেহিসাবী ব্যয় দুই প্রকারে হইয়া থাকে। একটি হইল প্রকাশ্য পাপকাজে ব্যয় করা আর অপরটি হইতেছে প্রকাশ্য পাপকাজে না হইলেও সীমাতিরিক্ত ব্যয় করা। জানিয়া রাখ, গর্ব ও বিলাসিতার কাজে ব্যয় করিবার পরিণতি লাঞ্ছনা। কারণ সম্পদেরও সীমা আছে। তাই সীমাতিরিক্ত ব্যয় করিলে শেষে ঘরবাড়ী পর্যন্ত বিক্রী করিতে হয়। মুসলমান কখনও অন্য জাতির দ্বারা ধ্বংস হয় না, ধ্বংস হয় নিজের হাতে। ইসলাম একটি দুর্গ। আল্লাহ মুসলমানদিগকে এই দুর্গে ঠাঁই

দিয়াছেন। এই দুর্গকে কেহই ভাঙ্গিতে পারে না। কিন্তু কেহ যদি শত্রুর জন্য নিজেই গেট খুলিয়া দেয় তবে তাহার আর প্রতিকার কি? আল্লাহ বলেনঃ فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহর দলই বিজয়ী হইবে। কিন্তু তাহারা যদি নিজেরাই সর্বনাশ ডাকিয়া আনে তবে তাহা ভিন্ন কথা। যেমন আমাদের নেতাদিগকে বিলাসিতার পাল্লায় পড়িয়া নিজের বিষয়-সম্পত্তি পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া শেষ পর্যন্ত ভিখারী হইতে দেখা যায়।

মহানবী (সঃ) বলেন, কেহ কোন কারণে জমি বিক্রী করিতে বাধ্য হইলে ঐ টাকা দিয়া তাহার অন্য একটি জমি কেনা উচিত। কারণ টাকায় বরকত নাই। আর বাস্তবেও দেখা যায় যে, টাকা হাতে থাকে না।

কোন মুসলমানের জমি কোন কাফেরের দখলে দেখিলে আমি দুঃখ পাই। কোন বাড়ীর মালিক মুসলমান বলিয়া জানিতে পারিলে আমি খুশী হই। আমি যদিও মুসলমানদের জন্য বিত্তশালী হওয়া পছন্দ করি না কিন্তু অন্য জাতির তুলনায় তো তাহাদের ধন-সম্পদ হওয়া উত্তম। কাহাকেও টাকা উড়াইতে দেখিলে আমি বলি, তাহার উচিত আল্লাহর নেয়ামতের কদর করা। অপব্যয়ে পাপ তো আছেই, পার্থিব দৃষ্টিতেও উহা ভালো নহে।

খানাপিনায় বাড়াবাড়ি করিতে গিয়া অনেক সময় মেহমানকে অনেক দেরীতে খাদ্য পরিবেশ করা হয়। দ্বীনকে ত্যাগ করিলে তাহার দুনিয়াও জটিল হইয়া যায়। আল্লাহ তওফিক দিলে ভালো খাইতে পরিতে বাধা নাই। তবে সীমার মধ্যে থাকিতে হইবে। আজকাল তো মানুষ বেশভুষা, খানাপিনা এমনকি বাড়ীঘর দ্বারা পর্যন্ত নিজের গর্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। অনেকের মূল্যবান সময় চলিয়া যায় ফ্যাশনের পিছনে। আমি এক ব্যক্তিকে জানি যে বারবার পোশাক বদলাইত। একবার সে আমার কাছে আসিয়া জানাইল যে, সময়াভাবে আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত। আমি বলিলাম হাঁ, আপনাকে তো আমি সর্বদা কাজে ব্যস্ত দেখি। ইহাতে সে লজ্জিত হইল। আজকাল মানুষ খানাপিনা, বেশভূষা ইত্যাদিতে বিজাতীয়দের অনুকরণ করিয়া থাকে। অথচ আমাদের ভাণ্ডারে সবকিছুই রহিয়াছে। তাই অপর জাতির নিকট হইতে আমাদের গ্রহণ করিবার মতো কিছুই নাই। এই সকল অনিষ্টের মূলে রহিয়াছে গর্ব ও অপব্যয়। গর্ব ও অপব্যয় বর্জন করিলে এই সকল অনিষ্ট হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে।

ইসলামে অনাড়ম্বর জীবন যাপনের মধ্যেই ইজ্জত নিহিত

সাদাসিদা চালচলনই গ্রহণ করা উচিত। কোন মেহমানের খাতিরে কিছুটা জাঁকজমক করিলেও তাহা সীমার মধ্যেই করা উচিত এবং বাড়াবাড়ি অনুচিত। ইহাতেই আমাদের ইজ্জত নিহিত। আজকাল মুসলমানরা পাশ্চাত্যের অনুকরণকেই মর্যাদার বিষয় বলিয়া মনে করে। আর তাহাদের বেশভূষা, রীতিনীতি ও সভ্যতা সংস্কৃতিকে গ্রহণ করিয়া উন্নতি করিতে চাহে। কিন্তু ইহাতে মুসলমানদের ইজ্জত আসিবে না। (মাজাহেরুল আমওয়াল, পৃষ্ঠা ঃ ২৯)

হযরত সুফিয়ান সাওরীর উপদেশ

হযরত সুফিয়ান সাওরী দুনিয়া ও দুনিয়াদারদিগকে ঘৃণা করিতেন। তিনি বলিতেনঃ "মালের কদর করা উচিত। মাল বাড়ানো উচিত নহে। আর হালাল মালে অপব্যয়ের সুযোগই বা কোথায়? আমাদের কাছে যদি টাকা পয়সা না থাকিত তবে শাসকগোষ্ঠী আমাদিগকে হেনস্থা করিয়া ছাড়িত।" বাস্তবিকই অর্থ ও সম্পদ থাকিলে তাহাকে কাহারও সামনে মাথা নীচু করিতে হয় না। শাসকগোষ্ঠী তাহাকে অপদস্থ করিতে পারে না। সে যে ইজ্জত পায়, অর্থহীন ব্যক্তি তাহা পায় না। এজন্যই মালের কদর করা কর্তব্য এবং সম্পদ নষ্ট করা বোকামী। মাল আমাদের নহে আল্লাহর। তাই তাহার বিনানুমতিতে উহা ব্যয় করা যাইবে না। অপব্যয় করিয়া টাকা উড়াইলে অসময়ে কেহ দিবে না। আজ যাহারা 'হুজুর' 'হুজুর' করিতেছে তাহারাই তখন তোমাকে গালি দিবে। তাই মালের হেফাজত করা কর্তব্য। অবশ্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যয় করিতে হইবে।

বরকতের হাকীকত

প্রত্যেক জিনিস এক একটা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হইয়াছে। ঐ জিনিস ঐ কাজে লাগিলে তাহাই বরকত এবং ঐ কাজে না লাগিলে তাহাই বরকতহীনতা। যেমন টাকা পয়সার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা উহাকে খাওয়া পরা ও শান্তি লাভের কাজে লাগাইব। যদি টাকা পয়সা খাওয়া পরার কাজে লাগে তাহা হইলে উহাই টাকা পয়সার বরকত। আর যদি উহা ঐ কাজে না লাগে বরং অপব্যয় করিয়া উড়ানো হয় তবে তাহাই বরকতহীনতা। (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ঃ ৩০২)

নামের জন্য অপব্যয়ের ও সর্বনাশের একটা দৃষ্টান্ত

অপব্যয় ও অমিতব্যয়ের দরুন মুসলমানরা ধ্বংস হইয়া গেল। কিন্তু তবুও তাহাদের চোখ খুলিল না। তাহারা একে অপরকে দেখিয়া উপদেশ লাভ করিতে পারিত কিন্তু তাহাও তাহারা করিল না। এক ব্যক্তি একটি গ্রামের মালিক ছিল। অপব্যয় করিতে করিতে তাহা শেষ হইয়া গেল। ছেলের বিবাহে দেদার খরচ করিল। বিবাহের পরে হযরত মাওলনা কাসেম (রহঃ) তাহার কাছে গেলেন এবং বলিলেন, ভাই সাহেব! টাকা থাকিলে মানুষ জমি কেনে, কেহ বা অলংকার কেনে। বিপদকালে উহা বিক্রয় করিলে পুরা দাম না হোক অর্ধেক দাম তো পাওয়াই যায়। আপনি টাকা ঢালিয়া যাহা কিনিয়াছেন অর্থাৎ 'নাম' উহার তো

কানাকড়িও দাম নাই। তাহাদের অবস্থা এই ছিল যে, তাহারা দূর-দূরান্ত হইতে পাহলোয়ানদিগকে দাওয়াত করিয়া আনিত। কুস্তি চলিত, খানাপিনা হইত আর এভাবেই তাহারা শেষ হইয়া গেল। (মলফুজাত, পৃষ্ঠাঃ ১৭২)

অব্যবস্থা ও বেপরোয়া ভাব ধ্বংসের কারণ বটে

মুসলমানরা ধ্বংস হইবে না তো আর কি হইবে? তাহাদের ধ্বংসের কারণই হইতেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অব্যবস্থা আর উহার মূলে রহিয়াছে বেপরোয়া ভাব। এই বেপরোয়া ভাবের দরুন কত জমিদার, নওয়াব প্রভৃতি পথের ভিখারী বনিয়াছে। ইহার কারণে রাজত্বও গিয়াছে। দুনিয়া তো দূরের কথা, ইহার কারণে দ্বীন পর্যন্ত বরবাদ হইয়া যায়।

কানপুরে জনৈক ব্যক্তি এক বেনিয়ার নিকট হইতে সাতশত টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু টাকা পরিশোধের জন্য তাহার কোন মাথাব্যথা ছিল না। আর ওদিকে বেনিয়াও চুপ। বেশ কিছুকাল পরে ঐ ঋণ সুদসহ চল্লিশ হাজার টাকায় দাঁড়াইল। তখন বেনিয়া তাহাকে বলিল, তোমার অমুক দোকানটি আমাকে দিয়া দাও এবং বাকী টাকা পরে দিও। কিন্তু ঐ দোকানের জনৈক কর্মচারী স্বীয় স্বার্থের জন্য দোকানটি বেনিয়াকে দিতে দেয় নাই। পরিণামে তাহাকে এই ঋণের দায়ে সমস্ত জমিজমা, ঘরবাড়ী ও দোকানপাট হারাইতে হইয়াছিল।

এই কানপুরেরই ঘটনা। জনৈক ধনী ব্যক্তি মারা গেলে তাহার পুত্র পিতার টাকা উড়াইতে শুরু করিল। মৃত ব্যক্তির এক বন্ধু ইহা জানিতে পারিয়া দুঃখিত হইলেন এবং তাহার নিকট আসিয়া অপব্যয়ের ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে তাহাকে অনেক বুঝাইলেন। সবকথা শুনিয়া ছেলেটি তাক হইতে একটি জাঙ্গিয়া বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, টাকা উড়ানোর পরিণতি যদি এতদূর হয় তবে তজ্জন্য আমি পূর্ব হইতে প্রস্তুত। যদি ইহারও নীচে দারিদ্রের কোন সীমা থাকে তাহা হইলে বলুন আমি চিন্তা করিয়া দেখি।

কানপুর জামে মসজিদে জনৈক ব্যক্তি চৌবাচ্চায় পানি ভরিত। লোকে তাহাকে 'নওয়াব সাহেব' বলিত। খোঁজ নিয়া জানা গেল, লোকটি প্রকৃতই নওয়াব ছিল। অপব্যয় ও বিলাসিতার দরুন আজ তাহার এই দশা। এই কারণেই মুসলমান আজ ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। তাহাদের দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই গোল্লায় যাইতেছে তবুও তাহাদের চোখ খোলে না। কেহ কেহ কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করিলেও তাহারা আয়ের চিন্তাই করে কিন্তু ব্যয়কে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে সে চিন্তা তাহাদের নাই। এ সম্পর্কে জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তির উক্তি খুবই সুন্দর। তিনি বলিতেন, 'মানুষ আয় বাড়ানোর চিন্তা করে। অথচ উহা তাহাদের ইচ্ছাধীন নহে। আর মানুষ ব্যয় সংকোচের চিন্তা করে না অথচ উহা তাহাদের ইচ্ছাধীন।'

ব্যয়ের দর্শন

আমাদিগকে চিন্তা-ভাবনা করিয়া ব্যয় করিতে হইবে। এ ব্যাপারে আমি এই নীতি নির্ধারণ করিয়াছি যে, ব্যয়ের পূর্বে অন্ততঃ তিনবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, এই ব্যয় কি এতই প্রয়োজনীয় যে, এ ক্ষেত্রে ব্যয় না করিলে আমার কোন ক্ষতি হইবে? এভাবে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে তখন চিন্তা করিবে যে, এত টাকাই কি ব্যয় করা প্রয়োজন না উহার কমেও কাজ চলিয়া যাইবে?

এভাবে চিন্তা করিতে গেলে প্রথম প্রথম আমাদের অসুবিধা হইবে। কারণ আমরা চিন্তা করিতে অভ্যস্ত নহি। পরে অবশ্য এভাবে চিন্তা করা সহজ হইয়া যাইবে এবং ইহা স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হইবে। চিন্তা ফিকির ও সুব্যবস্থা প্রয়োজনীয় বস্তু আর চিন্তাহীনতা ও অব্যবস্থা ক্ষতিকর। (আল ইফাজাত, মলফুজ ঃ ৫৭)

কৃপণতা ও অপব্যয়ের হাকীকত

যে যাহাই বলুক না কেন সুব্যবস্থাপনার জন্য কিছুটা কৃপণতার প্রয়োজন আছে। কৃপণতা মাত্রই নিন্দনীয় নহে। যেমন লোভ এমনকি যৌনতাও সীমার মধ্যে থাকিলে তাহা নিন্দনীয় নহে। কবি বলেনঃ

اے بسا امساك كنز اتفاق به * مال حق را جز ما برحق مده

আজকাল যাহাকে আমরা দানশীলতা বলি উহা খোলাখুলি অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নহে। পক্ষান্তরে কৃপণতার দুইটি দিক হইতে পারে– ভালো ও মন্দ। কৃপণতা অর্থ অন্তরের সংকোচন। ইহার বিভিন্ন স্তর হইতে পারে। যেমন কেহ টাকা জমাইল এবং স্ত্রী-পুত্রের ভবিষ্যৎ সুখের আশায় টাকাগুলি ব্যয় করিল না। ইহাকে নিন্দনীয় বলা যাইবে না। পক্ষান্তরে অমিতব্যয়িতা সর্বতোভাবে নিন্দনীয় এবং উহা কৃপণতার চেয়েও নিকৃষ্ট। আর কৃপণতা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশংসনীয়ও বটে। যেমন দুর্দিনের জন্য সঞ্চয়।

এক হাকীম সাহেব ছিলেন বিজ্ঞ চিকিৎসক ও রসিক ব্যক্তি। তাহার সামনে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ঈমানের নিরাপত্তা ও খাতেমা বিল খায়েরের জন্য দোয়া করিল। হাকীম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি এই দোয়ার অর্থ বোঝেন? তিনি বলিলেন, আপনিই বলুন। হাকীম সাহেব বলিলেন, ঈমানের নিরাপত্তা হইতেছে পেট ভরিয়া আহার জোটা এবং খাতেমা বিল খায়ের হইল কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়া। ইহাই বড় নেয়ামত। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ২৮৩)

অপব্যয় কৃপণতার চেয়েও ক্ষতিকর

কৃপণতার পরিণাম হইল অন্যের উপকার না করা আর অপব্যয়ের পরিণাম হইল অন্যের ক্ষতি করা। কারণ অমিতব্যয়ী নিজের টাকা না থাকিলে অন্যকে ধোঁকা দিয়া কর্জের নাম করিয়া তাহার নিকট হইতে টাকা আনিয়া উড়ায়। পরে আর উহা শোধ করে না। এতদ্ব্যতীত আমি অমিতব্যয়ীকে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হইয়া যাইতে দেখিয়াছি কিন্তু কৃপণকে এরূপ হইতে দেখি নাই। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ২৬৫)

অপব্যয় খুবই ক্ষতিকর। উহা হইতে বাঁচিয়া থাকাতেই বরকত রহিয়াছে। অপব্যয়ের দরুনই মুসলমানগণ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। আমি ইহাও বলি যে, সুব্যবস্থাপনার জন্য কিছুটা কৃপণতারও প্রয়োজন আছে বৈ কি। আর উহাও প্রকৃত প্রস্তাবে কৃপণতা নহে। আর কৃপণতা হইলেও অপব্যয় উহার চেয়েও খারাপ। অপব্যয়ের পরিণাম উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা। কিন্তু কৃপণতা ঐরূপ নহে।

অপব্যয় মানুষকে কুফরী পর্যন্ত নিয়া পৌঁছায়

এমন অনেক ঘটনা আছে যে, অপব্যয়ের পরিণাম হইয়াছে কুফরী। কারণ হাতে টাকা না থাকিলে অমিতব্যয়ী ব্যক্তি দিশাহারা হইয়া দ্বীনকেই বিক্রয় করিয়া বসে। কৃপণের অবস্থা এমন হয় না। সে দিশাহারা হয় না। কারণ তাহার হাতে টাকা থাকে যদিও সে খরচ করে না। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দিশাহারা হওয়া ও না হওয়ার। (আল ইফাজাত, মলফুজ ঃ ১০৫)

টাকার কদর করা উচিত। কারণ টাকা না থাকিলে মানুষ অনেক বিপদে পড়ে। তন্মধ্যে একটি বিপদ হইল দ্বীনকে বিসর্জন দেওয়া।

দ্বীন ও ঈমানের হেফাজত

দ্বীনের হেফাজতের জন্য আজকাল কাছে কিছু টাকাও জমা রাখা দরকার। (আনফাসে ইসা, পৃষ্ঠা ঃ ৩০৮)

অধিকাংশ মানুষের জন্য তাহাদের নিজেদের কাছে প্রয়োজন মাফিক কিছু টাকাও জমা রাখা দরকার। কারণ তাহাদের তাকওয়া ঐ টাকা পর্যন্তই। উহারা কাছে টাকা পয়সা থাকিলে নামায রোযা করে আর টাকা না থাকিলে সব ছাড়িয়া দেয়। এই জন্য বুযুর্গানে দ্বীন অনেককেই চাকুরী ছাড়িয়া দিতে এমনকি অনেককে নাজায়েয চাকুরীও ছাড়িয়া দিতে নিষেধ করেন। তাহারা বলেন, যতদিন পর্যন্ত হালাল চাকুরী বা অন্য কোন হালাল পেশা না পাও ততদিন পর্যন্ত বর্তমান চাকুরীই করিতে থাক এবং তাওবা ও এস্তেগফার করিতে থাক। কারণ এই চাকুরী হারাম হইলেও ইহা দ্বারা ঈমানের হেফাজত তো হইতেছে। চাকুরী ছাড়িয়া দিলে তো অর্থাভাবে নিজের ঈমানই হারাইবে।

মুসলমানদের দুর্বলতার অন্যতম কারণ দারিদ্র্য

দারিদ্র্য মুসলমানদিগকে অনেক দাবাইয়া দিয়াছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের সহিত আমাদের অবস্থার তুলনা করা অনুচিত। কারণ তাহাদের মধ্যে ঈমানের শক্তি ছিল। তাই তাহারা দারিদ্র্যের কারণে উদ্বিগ্ন হইতেন না। আর বর্তমান যুগে আমাদের মধ্যে ঈমানের শক্তি তো নাই-ই তদুপরি যদি আর্থিক শক্তিও না থাকে তাহা হইলে আমাদের লাঞ্ছনার আর শেষ থাকিবে না।

অল্পেতুষ্টির পদ্ধতি

নিজের প্রয়োজনকে সীমিত রাখিলেই অল্পেতুষ্টি (কানায়াত) অর্জন করা সম্ভব। প্রয়োজনের সীমা ছাড়াইয়া গেলে অল্পেতুষ্টি অর্জন কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। (আল ইফাজাত, পৃষ্ঠা ঃ ৩০৫)

অপব্যয় অবৈধ আয়ের অন্যতম কারণ

অনেকে বলিয়া থাকে, সুদ-ঘুষ না খাইলে সংসার চলিবে কেমন করিয়া? আমরা বলি, খরচ এত বাড়ানোর কি দরকার? আপনি তো নিজেই সাধ করিয়া খরচ বাড়াইয়া লইয়াছেন। আর বলিতেছেন যে, ঘুষ না লইলে চলে কিভাবে? এমন খরচ বাড়ানোর কি প্রয়োজন যাহার জন্য সুদ-ঘুষ খাইতে হয়? (আল মুবাল্লিগ, শা'বান, ১৩৬০)

ঘুষের টাকা থাকে না

ঘুষখোররা যত টাকাই জমাক এক দুই পুরুষ পরে উহার কিছুই থাকে না। (আনফাসে ঈসা, পৃষ্ঠা ঃ ৩০২)

অপব্যয়ের নাম নাকি উন্নত চিন্তা

এন্তেজাম বা সুব্যবস্থাপনার অর্থ এই– ব্যয়ের পূর্বে চিন্তা করিবে যে, এই ব্যয় না করিলে তাহাতে আমার দ্বীনি বা পার্থিব কোন ক্ষতি হইবে কি-না। ক্ষতির আশংকা থাকিলে ব্যয় করিবে নতুবা ব্যয় করিবে না।

আজকাল অপব্যয়কে বলা হয় উন্নত চিন্তা। এই উন্নত চিন্তার মাহাত্ম্য এই যে, নিজের মাল শেষ করিয়া এবার নজর পড়ে অন্যের মালের উপর। কর্জ করিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সুদ দিয়াও। ইহার পরিণতি আমাদের জানা অর্থাৎ দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টিই বরবাদ। (আল ইফাজাত, পৃষ্ঠা ঃ ২৪৮)

পাপ বর্জন করিলে মৃত্যু সহজ হয়

একটি প্রবন্ধে পড়িলাম, পাপ কম করিও অর্থাৎ করিও না তাহা হইলে মৃত্যু সহজ হইবে এবং টাকা ধার করিও না তাহা হইলে স্বাধীনভাবে জীবন কাটাইতে পারিবে। পাপ বর্জন করার গুণ ইহাই যে, মৃত্যু সহজে হয়।

অতীব প্রয়োজনের সময়ে ধার করা জায়েয। যেমন জেহাদ বা কাফন দাফনের জন্য বা জামা ছিঁড়িয়া গেলে। এমন ব্যক্তিদের ধার পরিশোধের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়াছেন। (আল ইফাজাত, পৃষ্ঠা ঃ ২২২)

রেওয়াজ ও প্রথার কারণে ঋণী হওয়া

এক বন্ধু আমাকে লিখিয়া জানাইলেন যে, মাত্র ত্রিশ টাকা বেতন পাই। ঘরে মেহমানের আনাগোনা অনেক। বেতনের টাকায় কুলায় না। এখন কি করি? আমি বলিলাম, লৌকিকতা বাদ দিন। খাবার সবার সামনে আনিয়া হাজির করিবেন এবং বলিবেন, ইহাই আমাদের খাবার। ইহাই সবাই ভাগ করিয়া খাইতে হইবে। তিনি তাহাই করিলেন। অতঃপর আমাকে চিঠিতে জানাইলেন যে, আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করুন। আপনি সুন্দর তদবির বলিয়াছেন। মেহমানদের আনাগোনা বন্ধ হইয়াছে।

আমি বলি, বিনা প্রয়োজনে ধার করিও না। যদি লোকাচারের বিপরীত চলিতে হয় তবুও না। ধার করিলে অনেক ভোগান্তি পোহাইতে হয়। ইহাই আল্লাহ ওয়ালাদের তরিকা। তাহারা স্বাধীনভাবে চলেন এবং লোকাচারের ধার ধারেন না। ইহাই সুন্দর পদ্ধতি এবং ইহাতেই রহিয়াছে শান্তি।

অপব্যয় হইতে মুক্তির পরামর্শ

অব্যবস্থাই আমাদের দুর্গতির কারণ আর অব্যবস্থার মূলে রহিয়াছে বেপরোয়া ভাব। এই বেপরোয়া চাল-চলনের বদৌলতে কত নওয়াব ও জমিদারের যে কপাল পুড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

আমাদিগকে বেপরোয়া হইলে চলিবে না। হিসাব করিয়া চলিতে হইবে। ব্যয়ের পূর্বে অন্ততঃপক্ষে তিনবার চিন্তা করিতে হইবে যে, এই ব্যয় জরুরী কি-না। জরুরী মনে হইলে ব্যয় করিবে, নচেৎ না।

প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাছাই

অপব্যয় হইতে বাঁচা এবং ঘরের সুব্যবস্থাপনার জন্য ধনীদের একটা কাজ করা উচিত। তাহা এই যে, প্রথমে ঠিক করিয়া লইতে হইবে যে, কোন জিনিস প্রয়োজনীয় এবং কোনটা অপ্রয়োজনীয়। ধনীদের একটা বদভ্যাস এই যে, কোন জিনিস পছন্দ হইলেই উহা কিনিয়া ফেলে। উহার প্রয়োজন থাকুক আর নাই থাকুক। তাহারা দোকানে গেলে কিছু না কিছু কিনিবেই। এই লজ্জায় যে, কেহ বলিবে– দোকানে আসিয়া কিছু না কিনিয়াই চলিয়া গেল। অথচ তাহাদের ঘরে এমন অনেক বাড়তি জিনিস থাকে যাহা সারা বৎসরেও কাজে লাগে না। কবি কি সুন্দর বলিয়াছেন–

حرص قانع نیست صائب ورنہ اسباب معاش

آنچه مادرکاز داریم اکثرے درکار نیست

অর্থাৎ "আসলে আমাদের লোভ সংযত হইতে চায় না। নতুবা আমরা যাহা দরকারী মনে করি উহার অধিকাংশ জিনিসেরই কোন দরকার নাই।"

তাই প্রথমেই ঠিক করিয়া লইতে হইবে যে, কোন কোন জিনিসটি দরকারী। যেগুলি দরকারী তাহা রাখিয়া দাও আর যেগুলি বেদরকারী উহা হয় বিক্রী করিয়া দাও আর না হয় ফকির মিসকীনকে দিয়া দাও। যদি দান করিতে মন না চায় তবে যাকাত হিসাবেই দিয়া দাও।

আমি অপব্যয় হইতে বাঁচিবার আরও একটি পন্থা বলিয়া দিতেছি। ঘরের দিকে তাকাও। ঘরে এমন অনেক জিনিস দেখিতে পাইবে যাহা হয় পঁচিতেছে আর না হয় উঁই লাগিয়াছে। এইগুলিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দাও। তাহা হইলে ঘরের শোভা বাড়িবে। একবার এইরূপ করিলে আগামীতে তুমি এইসব জিনিস আর কিনিবে না।

ইহসানের উত্তম পদ্ধতি

আরেকটি কাজের কথা বলিতেছি। যদি মুসলমানদের উপকার করিতে চাও তাহা হইলে বড় দস্তরখানা বানাইয়া আজ বিরিয়ানী কাল পোলাও কোর্মা রান্না করিয়া বন্ধু-বান্ধবদিগকে দাওয়াত করিয়া খাওয়ানোর প্রয়োজন নাই। ইহাতে শুধু খানার পিছনেই কত টাকা চলিয়া যাইবে। অথচ ইহার প্রয়োজন ছিল না। পক্ষান্তরে এই টাকা দিয়া তুমি কয়েকজন গরীব মুসলমানের উপকার করিতে পারিতে। বন্ধুদের উপকার করিতে চাহিলে তাহাদিগকে নগদ টাকা দিয়া সাহায্য কর। দামী পোশাক উপহার দিবার প্রয়োজন নাই।

চিন্তা করিয়া কাজ করিও

কোন কিছু করিতে হইলে চিন্তা-ভাবনা করিয়া লইও। হঠাৎ করিয়া কোন কাজ করিও না। পরের কথায় কোন কাজ করিও না। নিজের বুদ্ধিতে চলিও। কোরআনে পরামর্শ গ্রহণের তাকীদ আসিয়াছে। কিন্তু সেখানে একথাও আছে যে, যাহা বোঝ তাহাই করিও।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ রাজনীতি

প্রথম পাঠ

জাতীয় স্বাতন্ত্র্য

তাশাব্বুহের হিকমত ও ব্যাখ্যা

হাদীসে আছেঃ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (যে যে জাতির অনুকরণ করিবে সে তাহাদেরই অন্তগর্ত।) একথা বলার হিকমত এই যে, বাতিলপন্থীগণ হইতে যেন আমাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। তাশাব্বুহ বা অনুকরণ জায়েয নাই, কারণ উহা ইচ্ছাকৃত। অবশ্য তাশাব্বুহ (অনুরূপ হওয়া) জায়েয আছে কারণ উহা প্রকৃতিগত। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ১৯৮)

কাফেরদের অনুকরণ নিষিদ্ধ হইবার কারণ এই যে, উহাতে কুফরী এবং কাফেরদিগকে শ্রদ্ধা করা বুঝায়। কারণ শ্রদ্ধা না থাকিলে কেহ কাহারও অনুকরণ করে না। আর কাফেরদিগকে শ্রদ্ধা করা হারাম। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ১৭)

জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হইলে জাতীয়তাই বিলুপ্ত হয়

অনেকে প্রাচীন সভ্যতা ত্যাগ করিয়া আধুনিক সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছে। আমি বলিতে চাই যে, জায়েয বা নাজায়েযের কথা বাদ দিলেও ইহার একটা ক্ষতিকর দিক এই যে, ইহারা দিবারাত্রি মানুষকে যে জাতীয়তার সবক দিয়া থাকে এবং বক্তৃতা ও বিবৃতিতে যে 'জাতি' 'জাতি' করিয়া গলাবাজী করে আধুনিক সভ্যতাকে গ্রহণ করিলে সেই জাতীয়তাকেই অস্বীকার করা হয়। কারণ প্রত্যেক জাতির নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য থাকে এবং এই স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করিলে জাতীয়তাকেই অস্বীকার করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মুখে মুখে ইহারা নিজদিগকে জাতির দরদী রূপে জাহির করে আর কাজকর্মের দ্বারা জাতীয়তারই মূলোৎপাটন করিয়া থাকে। ইহাদের কাজকর্মে এবং চালচলেন ইসলামের স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়াই ওঠে না বরং মনে হয় যেন ইহারা জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন আলাদা কিছু। ইহাদের অবস্থা তো এইরূপঃ

یکے بر سر شاخ و بن می برید * خدا وند بستان نگہ کردو و دید

এতদ্ব্যতীত অপরাপর জাতির রীতিনীতি গ্রহণ করার অর্থ একথারই স্বীকৃতি প্রদান যে, ইসলামে উন্নত আচার ব্যবহারের শিক্ষা নাই। তাহাই যদি না হইবে তাহা হইলে ইহারা বিজাতীয়দের অনুকরণ করিবে কেন?

আত্মমর্যাদাবোধের দাবী

জাতীয়তাবোধের দাবী তো ইহাই যে, ইসলামের সামাজিক বিধান যদি অসম্পূর্ণও হয় তবুও উহাই গ্রহণ করা এবং বিজীয়দের সমাজ ব্যবস্থা বর্জন করা। কবি বলেনঃ

کہن خرقہ خویش پراستن * بہ ازجامۂ عاریت خواستن

অর্থাৎ "অপরের নিকট হইতে ধার করা শাল অপেক্ষা নিজের ছেঁড়া কম্বলই উত্তম।" আর জায়েয নাজায়েযের কথা বাদ দিলেও অন্য জাতির রীতিনীতি গ্রহণ করিলে নিজস্ব জাতীয় সত্তা বলিতে কিছুই থাকে না। তদুপরি ইহাতে ইসলামের অমর্যাদাও হয়। কারণ আমরা যদি বিজাতীয়দের অনুকরণ করি তাহা হইলে ইসলামের মর্যাদা আর থাকে কোথায়? (তাফসিলুদ দ্বীন, পৃষ্ঠা ঃ ৬-৬২)

হিন্দুরা তাহাদের জাতীয় আদর্শের অনুসারী আর মুসলমানরা ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করিতে চায়

আমার কাছে এই বিষয়টি আশ্চর্য লাগে যে, কংগ্রেসী মুসলমানরা সব কাজেই হিন্দুদের অনুকরণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু হিন্দুরা যেভাবে তাহাদের জাতীয় পতাকা ও জাতীয় আদর্শকে শ্রদ্ধা করে সেভাবে ইহারা নিজেদের আদর্শকে শ্রদ্ধা করে না। হিন্দুরা কাহারও খাতিরে তাহাদের মনগড়া ধর্মের রীতিনীতি বিসর্জন দিতে রাজী নহে। আর ইহারা হিন্দুদের খাতিরে আসমানী ধর্মের বড় বড় বিধানগুলি পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পিছপা হয় না। ইহাদের উদ্দেশ্য ইহা ব্যতীত আর কি হইতে পারে যে, মুসলমানরা অন্য জাতির অনুকরণ করিয়া উন্নতি করুক, মুসলমান হইয়া নহে।

অন্যান্য জাতির রীতিনীতি ও ঈমানের নিরাপত্তা

কোন ইসলাম বিরোধীকে খুশী করিবার জন্য ইসলামী ঐতিহ্য বিসর্জন দেওয়া কবিরা গোনাহ। (সুন্নাতে ইবরাহীম, পৃষ্ঠা ঃ ৩১)

আজকাল লোকেরা বিজাতীয় রীতিনীতি গ্রহণ সম্পর্কে বলিয়া থাকে যে, ইহাতে কি ঈমান চলিয়া যায়?

এ সম্পর্কে আমি দুইটি উদাহরণ দিতেছি। তন্মধ্যে একটি এই– বর্তমানে ইংরেজ ও জার্মানদের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে। এখন কোন বৃটিশ সৈন্য যদি জার্মান সৈন্যদের উর্দি পরে এবং নিজ দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করে তাহা হইলে ইহা কি তাহার অফিসারের নিকট আপত্তিকর ঠেকিবে না। (আল আকেলাতুল গাফেলাত)

বাহ্যিক ঐক্যের প্রভাব অন্তরের ঐক্যের উপরে

মনের ঐক্যের উপরে বাহ্যিক ঐক্যের প্রভাব অপরিসীম। যে জাতি বাহ্যিক সম্প্রীতি বজায় রাখে না তাহারা অন্তরেও এক হইতে পারে না। মহানবী (সঃ) এই কারণেও কাফেরদের অনুকরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং ইসলামী ঐতিহ্যের অনুসরণ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। আমি বিশেষভাবে নেতৃবৃন্দকে ইসলামী আদর্শ অনুসরণ করিতে আহ্বান জানাইতেছি। কারণ তাহারা সংশোধন হইলে তাহাদের দেখা দেখি জনসধারণও সংশোধন হইয়া যায়। আর একথাও সত্য যে, ধর্মীয় উদ্দীপনা না জাগিলে তোমাদের উন্নতি হইবে না।

শরীয়তের অনুসরণেই মুসলমানের ইজ্জত

তোমরা শরীয়তের উপরে চলিয়া দেখ ইনশাআল্লাহ সবাই তোমাদিগকে সম্মান করিবে। ইহার প্রমাণ এই যে, যাহারা খাঁটি মুসলমান ইংরেজ, হিন্দু ও পারসিক সব জাতিই তাহাদিগকে সম্মান করিয়া থাকে। তোমরাও দ্বীনের উপরে থাকিলে সব জাতিই তোমাদের বশ্যতা স্বীকার করিবে। (কামালাতে আশরাফিয়া, পৃষ্ঠা ঃ ৭৭)

দ্বীনের চেতনা

পার্থিব স্বার্থের উপরে দ্বীনী চেতনাকে স্থান দেওয়ার একটি ঘটনা মনে পড়িল। শাহ মুহাম্মদ ইসহাককে বাদশাহ মাসোহারা প্রদান করিতেন। ইংরেজদের আগমনের পরে তাহার মাসোহারা আরবী মাসের স্থলে ইংরেজী মাসে দেওয়া হইত। তাহার মাসোহারা আসিলে তাহাকে রসিদের উপরে নাম দস্তখত করিতে ও ইংরেজী তারিখ লিখিতে বলা হইল। শাহ সাহেব বলিলেন, আমি ইংরেজী তারিখ লিখিতে রাজী নহি। তদুত্তরে তাহাকে জানানো হইল যে, ইংরেজী তারিখ না লিখিলে মাসোহারা পাওয়া যাইবে না। তিনি বলিলেন, আমি বিধর্মীদের অনুকরণ করিতে রাজি নহি। তাহাতে মাসোহারা বন্ধ হয় হউক। আল্লাহই রিযিকদাতা– ইংরেজ নহে।

নামায আমাদের স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক

আধুনিক শিক্ষিতরা জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের উপর গুরুত্বারোপ করিয়া থাকে। আমি বলি, তোমরা জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক হিসাবে নামাযকেই গ্রহণ করিয়া লও। মহানবী (সঃ)-এর যুগ হইতে শুরু করিয়া কেয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের মুসলমানদের জন্য ইহার চেয়ে বড় জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক আর কি হইবে যাহাতে ধনী দরিদ্র সবাই সমানভাবে শরীক? এবং যদ্দ্বারা কাফেরগণ পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারে যে ইহারা একটি জাতি? সুতরাং দ্বীন ও ইবাদত হিসাবে না লইয়া অন্ততঃ জাতীয় ঐতিহ্য হিসাবে হইলেও নামাযকে তোমাদের গ্রহণ করা উচিত।

দ্বিতীয় পাঠ

ঐক্য অনৈক্য

অনৈক্যের ক্ষতি কোন স্তরের?

এ সম্পর্কে মহানবী (সঃ) বলেনঃ

فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَاِنَّهَا هِىَ الْحَالِقَةُ

অর্থাৎ "নিজেকে পারস্পরিক ফেতনা ফাসাদ হইতে বাঁচাও। কারণ ইহা কামাইয়া ফেলে।" হাদীসের বাহ্যিক অর্থে মনে হয় যে, ফেতনা ফাসাদ করিলে মাথার চুল ঝরিয়া যায়। কিন্তু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, বারবার ফেতনা ফাসাদ করিলেও তাহাতে মাথার চুল ঝরিয়া যায় না। তাই মহানবী (সঃ) কথাটি আরেকটু খোলাসা করিয়া বলেনঃ

لَا اَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ بَلْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ

অর্থাৎ "আমি বলি না যে, ইহাতে মাথার চুল ঝরিয়া যায় বরং আমি বলিতে চাই যে, ইহাতে দ্বীন ঝরিয়া যায়।" এখন হাদীসের মর্মার্থ এই দাঁড়াইল যে, দ্বন্দ্ব কলহে দ্বীন খতম হইয়া যায়। আর ইহার চেয়ে বড় ঈমানের ক্ষতি আর কি হইতে পারে?

যদিও মহানবী (সঃ) এই হাদীসে দ্বন্দ্ব কলহ সম্পর্কে কঠোর উক্তি করিয়াছেন তথাপি তিনি আমাদিগকে একেবারেই নিরাশ করেন নাই। কারণ তিনি ফেতনা ফাসাদকে حالقة বলিয়াছেন। কারণ উহা দ্বীনকে কাটিয়া ফেলে। কিন্তু চুল কামাইয়া ফেলিলেও উহার গোড়া অবশিষ্ট থাকে এবং কয়েকদিন কামানো বিরতি দিলে চুল আবার পূর্ববৎ গজাইয়া যায়। অনুরূপভাবে দ্বন্দ্ব কলহে দ্বীনের মূলোৎপাটন হয় না। সুতরাং তওবা করিয়া সংশোধন হইলে সব ঠিক হইয়া যাইবে।

ঐক্যের ভিত্তি

মানুষ আজকাল 'ঐক্য' 'ঐক্য' করিয়া চীৎকার করে। কিন্তু উহার মূল কি তাহা তাহারা জানে না। ঐক্যের মূল হইতেছে বিনয়। উহা ব্যতীত ঐক্য হইতে পারে না। আজকাল ঐক্য অর্থ মানুষ অপরকে নিজের সমমনা ও মতানুসারী বানানো বুঝিয়া থাকে। যদি অপরেও ঐরূপ চায় তাহা হইলে ঐক্য হইবে কিরূপে? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আত্মগরিমা থাকিলে ঐক্য হইতে পারে না। যদি হয় তবে উহা শুধু মৌখিক ঐক্য হইবে। ইহার উদাহরণ ইমাম আবূ হানিফা কর্তৃক তদীয় পুত্র হাম্মাদকে কৃত ওসিয়ত। তিনি তাহাকে বাহাস না করার জন্য

ওসিয়ত করিয়াছিলেন। হাম্মাদ বলিলেন, আপনি তো আজীবন বাহাস করিয়াছেন। আর এখন আমাকে বাহাস করিতে নিষেধ করেন কেন? ইমাম সাহেব বলিলেন, আমার ও তোমাদের বাহাসের মধ্যে পার্থক্য এই যে, আমি বাহাসকালে এই আশা করি যে, আমার প্রতিপক্ষের মুখ দিয়া সত্য প্রকাশ পাক এবং আমি তাহা মানিয়া লই, যাহাতে আমার ভাই জিতিয়া যায়। আর তোমরা বাহাসকালে এই আশা কর যে, তোমাদের প্রতিপক্ষের মুখ দিয়া যেন সত্য প্রকাশ না পায় যাহাতে তুমি জিতিয়া যাইতে পার। আমি প্রতিপক্ষের হেদায়াত কামনা করিতাম আর তোমরা কামনা কর তাহার গোমরাহী।

ইমাম সাহেব এবং তদীয় পুত্র হাম্মাদের মধ্যে স্বল্পকালের ব্যবধানেই কত পার্থক্য সূচীত হইয়াছে। আর আমাদের অবস্থা তো এই যে, আমরা প্রতিপক্ষের বিরোধিতা করিতেই থাকিব তা সে সত্যই বলুক না কেন। (আল এরতেবাত)

বিরোধিতার কারণ

কাজ উদ্দেশ্য না হইয়া নাম উদ্দেশ্য হইলে সেখানে বিরোধিতার উৎপত্তি হয়। তখন দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, কলহ ও বিবাদ। (আল-ইফাজাত, পৃষ্ঠা ঃ ২৮৩)

গাফিলতির সময় নাই

মুসলমানদের এখন গাফিলতির সময় নাই। কিন্তু তাহারা গাফিলতি হইতে সচেতন হইলেও তাহাদের অবস্থা এই পর্যায়ের–

اگرغفلت سے باز آیا جفاکی * تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی

এই সচেতনতায় না হয় শরীয়তের পাবন্দী, আর না হয় পারস্পরিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ২১২)

আমাদের সংগঠনগুলি ব্যর্থ কেন

আমাদের সংগঠনগুলির ব্যর্থতার কারণ এই যে, আজকাল মানুষের মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার মানসিকতা নাই। আজকাল ছোট বড় প্রত্যেকেই একে অপরকে নিজের মতের অনুসারী বানাইতে চায়। আর সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ? উহা আসলে সংখ্যাগুরিষ্ঠের মত নহে, একজনের মত মাত্র। কারণ এক্ষেত্রে একই ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত প্রভাব খাটাইয়া নিজের মতের সমর্থন আদায়ের জন্য পূর্ব হইতে এমন সব লোকদিগকে শিখাইয়া রাখে যাহারা বিষয়টি বুঝাতো দূরের কথা সঠিকভাবে বলিতেও পারে না। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হয় নাম কা ওয়াস্তে। আর তাহা ছাড়া এই মতের সংখ্যাগরিষ্ঠতাও অর্জিত হয় যোগ্যতার ভিত্তিতে নহে, অর্থ ও সম্পদের ভিত্তিতে।

অর্থাৎ এমন সব লোক দিয়া নিজের মত সমর্থন করানো হয় যাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধনী। অথচ এক্ষেত্রে আসল প্রয়োজন বিষয়টি অনুধাবনের। এভাবেই আজকাল নেতৃত্বও ধনীদিগকে অর্পণ করা হয় যদিও সেই ধনীরা ইহাও জানে না যে, নেতৃত্ব কাহাকে বলে।

কানপুরে একটি সভা ছিল। ঐ সভায় জনৈক ব্যক্তি শ্রোতাদিগকে নিজের সমর্থন প্রদর্শন করিতে চাহিল। আর এই উদ্দেশ্যে সে জনৈক শেঠ ব্যক্তিকে সাথে অনিল এবং পথে তাহাকে খুব করিয়া বুঝাইল যে, আমার বক্তৃতা শেষ হইলে তুমি দাঁড়াইয়া বলিবে, আমি তাহার তায়ীদ (সমর্থন) করি। সে ছিল একটা মূর্খ। এতটুকু কথাও সে গুছাইয়া বলিতে পারিত না। যাহা হউক, সে এই বাক্যটি বারবার আওড়াইতে আওড়াইতে সভাস্থলে আসিল। বক্তৃতা শেষ হইলে সে দাঁড়াইয়া বলিল, আমি তাহার তারদীদ (বিরোধিতা) করি। তায়ীদ এর স্থলে সে ভুলে তারদীদ বলিল। বক্তা তাহাকে আস্তে বলিল, বল তায়ীদ করি। এবারে সে বলিল আমি তাহার তারীদ করি। ইহা ছিল একটি অর্থহীন শব্দ। বক্তা আবার বলিল, বল তায়ীদ করি। এবারে সে বলিল, আমি তাহার তাকীদ করি। বক্তা ইহাতেই খুশী হইল কারণ অর্থের দিক দিয়া তাকীদ শব্দটি 'তায়ীদ' এর কাছাকাছি।

শরীয়তের দৃষ্টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত কিছুই নহে

আমাদের দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত সংগ্রহের নামে যাহা করা হয় তাহা এই– উকিল যেভাবে সাক্ষীদিগকে পড়াইয়া থাকে ঐ ভাবে প্রথমে ভোটারদিগকে পড়ানো হয় যে, আমি এইরূপ বলিলে তোমরা ঐরূপ বলিও। ইহা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হইল কোথায়? ইহা তো এক ব্যক্তির মত মাত্র। আর অন্যরা হইল উহার অনুসারী। ইহা বোকাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আর শরীয়তে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বলিয়া কিছুই নাই।

বদলোক অন্যকে নিজের অনুসারী বানাইতে চায়

আমাদের সংগঠনগুলি এই কারণে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করিতে পারিতেছে না যে, ইহার সদস্যগণ একে অপরকে নিজের মতের অনুসারী বানাইতে চায়। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের চরিত্র উন্নত মানের নহে। ইহাদের কেহ কাহারও চেয়ে ছোট হইতে রাজী নহে। তাই শীঘ্রই ইহাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় এবং প্রত্যেকেই নিজের মতের উপর জিদ ধরিয়া থাকে। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই সংগঠনগুলি শেষ দশা প্রাপ্ত হয়।

পারিলে কাজ একাই কর আর দল হইলে ধার্মিকদের দল হউক

এজন্যেই আমি বলিয়া থাকি যে, কোন কাজ নিজে করিতে পারিলে উহা দলের সহিত মিলিয়া করিতে যাইও না, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়,

দলের সঙ্গে কাজ করিতে গিয়া কাজই ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। এভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুনিয়ার কাজও হয় না। আর হইলেও তাহাতে দ্বীনের সর্বনাশ হইয়া যায়। আর যে কাজ একাকী করা যায় না তাহা দলের সঙ্গে মিলিয়াই করা উচিত। ইহার জন্য যদি ধার্মিকদের দল পাওয়া যায় তবে মিলিয়া কাজ করিও। কিন্তু দলের সবাই যেন ধার্মিক হয় অথবা দলে যেন ধার্মিকদের প্রাধান্য থাকে।

দলে দুনিয়াদারদের প্রাধান্য হইলে তাহাদের সহিত মিলিয়া কাজ করা জরুরী নহে

আর যদি দলে দুনিয়াদারদের প্রাধান্য হয় এবং ধার্মিকগণ কোণঠাসা হয় তাহা হইলে এমন দলের সহিত মিলিয়া কাজ করা ওয়াজেব নহে। তখন আপনি ঐ কাজ করিতে বাধ্য নহেন। কারণ উহা বাহ্যতঃ দল হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা বিচ্ছিন্নতা মাত্র। আর উহা تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى -এর পর্যায়ভুক্ত। তখন বলিতে হইবে যে, দলই নাই। সুতরাং দলের সহিত মিলিয়া কাজ করা ওয়াজেব হইবে কিরূপে?

ঐক্যের শর্তাবলী

আজকাল নেতৃবৃন্দকে বক্তৃতা বিবৃতিতে প্রায়ই 'ঐক্য' 'ঐক্য' করিতে শোনা যায়। উহার অর্থ শুধু ইহাই যে, তোমরা সবাই আমার মত মানিয়া লও। প্রত্যেকেই একে অপরকে নিজের মত মানিয়া লইতে বলে। এভাবে চলিলে কেয়ামত পর্যন্ত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না। ঐক্য প্রতিষ্ঠার পন্থা এই যে, প্রত্যেককেই একথা মনে করিতে হইবে যে, কেহ আমাকে না মানিলেও আমি তাহাকে মানিব।

হযরত হাজী ইমদাদ উল্লাহ বলিতেন, আজকাল লোকে ঐক্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা ঐক্যের মূল কি তাহা জানে না। ঐক্যের মূল হইল বিনয়। ইহা একজন সুফী বুযুর্গের উক্তি– যে উক্তির সামনে দার্শনিক তত্ত্ব ও বিশ্লেষণের কোন মূল্যই নাই। তার বিনয় অর্জনের জন্য কোন কামেল বুযুর্গের পদতলে ঠাঁই লওয়া জরুরী। মাওলানা রুমী বলেনঃ

قال را هرگز مرد حال شو * وپيش مرد كاملے پامال شو

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঐক্য নির্ভর করে বিনয়ের উপর, আর বিনয় নির্ভর করে চারিত্রিক সংশোধনের উপর, আর চারিত্রিক সংশোধন নির্ভর করে কোন কামেল বুযুর্গের ছোহবতের উপর। কামেল বুযুর্গের ছোহবত অর্জন না করিলেও অন্ততঃপক্ষে তাহার গীবত শেকায়েত তো করা অনুচিত।

ঐক্যের সীমাসমূহ

উপরে বর্ণিত শর্তাবলী ছাড়াও ঐক্যের ক্ষেত্রে ইহাও জরুরী যে, অন্যের সহিত মেলামেশা করিতে গিয়া তাহাকে নিজের গোপন কথা বলিয়া দিও না। কারণ এই সম্পর্ক স্থায়ী নাও হইতে পারে। তখন নিজের গোপন কথা ফাঁস করার দরুন পস্তাইতে হইবে। হাদীসে আছে–

اَحْبِبْ حَبِيْبَكَ هَوْنًا مَا عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ بَغِيْضَكَ يَوْمًا مَا وَاَبْغِضْ بَغِيْضَكَ هَوْنًا مَا عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ حَبِيْبَكَ يَوْمًا مَّا ـ

অর্থাৎ বন্ধুর সহিত সীমার মধ্যে থাকিয়া বন্ধুত্ব করিও। ইহাতে বেশী বাড়াবাড়ি করিও না। কারণ হয়তো কোন দিন সে তোমার শত্রুতে পরিণত হইতে পারে। আর ঘরের মানুষের শত্রুতা বেশী মারাত্মক হইয়া থাকে। আর যদি কোন বন্ধুর শত্রুতে পরিণত হওয়ার আশংকা না থাকে তবে নিজের সম্পর্কে এই আশংকা করা উচিত যে, হয়তো আমি নিজেই কোনদিন বদলাইয়া যাইতে পারি। সুতরাং ঐক্যের ক্ষেত্রেও সতর্কতার প্রয়োজন অছে বৈকি।

শত্রুতার সীমাসমূহ

অনুরূপভাবে কাহারও সহিত শত্রুতা করিতে হইলে সীমার মধ্যে থাকিয়া শত্রুতা করিও। সীমার বাহিরে যাইও না। কারণ হয়তো তাহার সহিত আবার কোনদিন বন্ধুত্ব করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। তখন তুমি তাহার দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইতে লজ্জাবোধ করিবে।

বন্ধুত্ব ও শত্রুতা সীমার মধ্যে থাকিয়া করিলে কখনও উদ্বেগ পোহাইতে হয় না।

কিছুটা অনৈক্যের প্রয়োজন আছে

কোন দল পাপকার্যে ঐক্যবদ্ধ হইলে তাহাদের বিরোধিতা করা এবং তাহাদের দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া শরীয়তেরই নির্দেশ। আর যদি কোন দল পাপকার্যের উপর ঐক্যবদ্ধ না হয় কিন্তু তাহারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরে পাপকার্য গ্রহণ করে তখন ধার্মিকদের কর্তব্য তাহাদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করা।

কিন্তু আজকাল দেখা যায়, ধার্মিক ও বে-দ্বীনরা মিলিয়া কোন কাজে ঐক্যবদ্ধ হইলে বে-দ্বীনরা নিজেদের কাজে অটল থাকে আর ধার্মিকরা কেন জানি দুর্বল হইয়া যায়। বে-দ্বীনরা তাহাদের ধর্ম ও রুচি মাফিক কাজ করিতে থাকে আর ধার্মিকরা জানে যে, এই কাজ আমাদের ধর্ম বা স্বার্থবিরূপ তবুও ঐক্য বজায় রাখার খাতিরে তাহারা বে-দ্বীনদের সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলে।

জানা দরকার যে, ঐক্য হয় দ্বিপাক্ষিকভাবে। যদি অপর পক্ষ তোমার স্বার্থ না দেখে তাহা হইলে আর ঐক্য রহিল কোথায়? ইহা তো অপর পক্ষকে তোষামোদ করা ছাড়া আর কিছুই নহে। যদি ঐক্যই হইত তাহা হইলে অপর পক্ষও তোমার স্বার্থ দেখিত। লোকে আজকাল তোষামোদকেই ঐক্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে। তাই তাহারা এই মনে করিয়া সম্পর্কচ্ছেদ করিতে ভয় পায় যে, লোকে নিন্দা করিয়া বলিবে, ইহারা ঐক্যে ফাটল ধরাইয়াছে। আমি বলিতে চাই, তোমরা এই নিন্দার ভয় কর কেন? পরিষ্কার বলিয়া দাও– হাঁ, আমরা ঐক্য বিসর্জন দিয়াছি। কারণ ঐক্য সর্বাবস্থায় প্রশংসনীয় নহে। কোন কোন ক্ষেত্রে অনৈক্যের প্রয়োজন আছে। বিশেষতঃ যখন ঐক্যের কারণে দ্বীনের ক্ষতি হয়। (আল এনসেদাদ)

সত্য ও মিথ্যার ঐক্যের প্রতিক্রিয়া

অধিকাংশ ক্ষেত্রে হক ও বাতিলের ঐক্যের প্রতিক্রিয়া ইহাই হইয়া থাকে যে, হকপন্থীরা বাতিলপন্থীদের মধ্যে মিশিয়া যায়। কিন্তু বাতিলপন্থীরা হকপন্থীদের মধ্যে মিশিয়া যায় না। ইহার রহস্য এই যে, হক হইতেছে কঠিন পথ। কারণ নাফস উহা চায় না। পক্ষান্তরে বাতিল হইতেছে সহজ পথ। কারণ নাফস উহাই চায়।

এখন ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে প্রত্যেককে নিজ নিজ আদর্শ কিছুটা ত্যাগ করিতে হয়। সে ক্ষেত্রে বাতিলপন্থী তাহার সহজ পথ ছাড়িয়া কঠিন পথকে গ্রহণ করিতে যাইবে কেন? ফলে হক ও বাতিলের ঐক্যের পরিণাম ইহাই দাঁড়ায় যে, হকপন্থীকেই তাহার আদর্শ কিছুটা ত্যাগ করিতে হয়।

দ্বীনের কাজ দুনিয়ার পদ্ধতিতে

আমাদের অবস্থা তো এই যে, আমরা যদি কোন কাজকে দ্বীনের কাজ মনে করিয়াও করি তবে উহাও করি দুনিয়ার পদ্ধতিতে।

اے بسرا یردہ یثرب بخواب - خیزکہ شد مشرق ومغرب خراب

ধর্মের দরদীরা এখন বারবার মহানবী (সঃ)-কে স্মরণ করিয়া বিলাপ করিয়া থাকেন। মুসলমানেরা কি ছিল আর কি হইয়া গেল! তাহাদের কোন কাজেই শ্রী নাই। (আসসুয়াল, পৃষ্ঠা ঃ ২৭-২৮)

তৃতীয় পাঠ

শত্রু ও মিত্র

আমরা মিত্রকে শত্রু ও শত্রুকে মিত্র মনে করি

মুসলমানদের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। আর সবচেয়ে বেশী দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, আমরা মিত্রকে শত্রু ও শত্রুকে মিত্র মনে করিয়া লইয়াছি। হক-এর অনুসরণ করিলে অচিরেই অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে। কিন্তু কে শোনে কাহার কথা! আমাদের অবস্থা তো এই–

کون سنتا ہے کہانی میری * اور پھر وہ بھی زبانی میری

ঢিলা কোর্তা, আলখেল্লা ও পাজামাওয়ালাদের কথা কেহ শুনিতে চাহে না। আমি সোজা কথা বলিয়া ফেলি তাই আমার সমালোচনা হয়। তাই আমি অধিকাংশ সময় এই কবিতা আবৃত্তি করি–

دوست کرتے ھیں شکایت غیر کرتے ھیں گلہ

کیا قیامت ھے مجھی کو سب برا کہنے کو ھیں

(মালফুজ, পৃষ্ঠাঃ ২৯৭)

শুধু একজনকেই খুশী করা প্রয়োজন

মুসলমানের প্রয়োজন শুধু একমাত্র মহান আল্লাহকে খুশী করা। তিনি খুশী থাকিলে অপর কাহারও অসন্তুষ্টিতে কিছু আসে যায় না। মুসলমানদের বর্তমান অবস্থাতো এই–

اس نقش پاکے سجدہ نے کیا کیا کیا ذلیل

ہم کوچہ رقیب میں بھی سر کے بل گئے

(আল ইফাজাত, পৃষ্ঠা ঃ ২০৮)

মুসলমানদের মিত্র

আল্লাহর সহিত সঠিক সম্পর্ক না রাখার কারণেই আমাদের যত দুর্ভোগ। মুসলমানদের দুর্বুদ্ধি এই যে, তাহারা বিজাতীয়দিগকে বন্ধু বলিয়া মনে করে এবং তাহাদের সাহায্য কামনা করে। আল্লাহ বলেন–

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ـ

এই আয়াতে আল্লাহ তাকীদ দিয়া বলিয়াছেন যে, আল্লাহ, রাসূল এবং মুমিনগণ ব্যতীত তোমাদের আর কোনই বন্ধু নাই। (আল ইফাজাত, মলফুজ ঃ ২২৪)

মুসলমানদের শত্রু

যতদিন পর্যন্ত আমরা কালেমা পড়িতে থাকিব ততদিন পর্যন্ত সমস্ত অমুসলিম আমাদের শত্রুই থাকিবে। তা তাহারা কালো গোরা যাহাই হউক না কেন। মুসলমানদের মধ্যে যে সকল বড় বড় তোষামোদকারী রহিয়াছে তাহারাও উহাদিগকে নিজেদের মিত্র বলিয়া মনে করে না। (আল ইফাজাত, মলফুজ ঃ ২৮৮)

কেহ কেহ কাফেরদের একদলকে মন্দ বলেন, আর কেহ মন্দ বলেন উহাদের অন্য দলকে। আমি বলি, উহাদের উভয় দলই খারাপ। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, একদল প্রকাশ্য নাপাক আর অন্যদল অদৃশ্য নাপাক কিন্তু নাপাক দুই দলই। (আল ইফাজাত, পৃষ্ঠা ঃ ৩০২)

গোরা কালো সাপ

সব কাফেরই মুসলমানের শত্রু। সাপ গোরা হউক আর কালো হউক উভয়ইটি তো সাপই বটে। বরং গোরা সাপের চেয়ে কালো সাপ বেশী বিষধর হয়। গোরা সাপকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেও দংশন করিবার জন্য কালো সাপই যথেষ্ট। আর ইহার দংশিত ব্যক্তি সাধারণতঃ বাঁচে না। (আল ইফাজাত, পৃষ্ঠাঃ ১৯৭)

ইংজেরা মুসলমানদিগকে আসল শত্রু মনে করে

কোন কারণে ইংরেজরা মুসলমানদিগকে কিছুটা সুবিদা দিলেও ইহা সুনিশ্চিত যে, উহারা ইসলামকে নিজেদের জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ভাবে। আর তাই তাহারা ইসলামকে ধ্বংস করিবার চিন্তা করে। তাহারা ইহাও জানে যে, হিন্দুদের সহিত ইংরেজদের বিরোধ শুধু রাজনৈতিক দাবী দাওয়া লইয়া। সুতরাং দাবীগুলি পূরণ করিয়া দিলে এই বিরোধ মিটিয়া যাইবে। কিন্তু মুসলমানদের সহিত ইংরেজদের বিরোধ ধর্মগত। সুতরাং এই বিরোধ মিটিবার নহে। তাই তাহারা মুসলমানদিগকেই আসল শত্রু বলিয়া মনে করে। (আল ইফাজাত)

জানিয়া শুনিয়া প্রতারিত হওয়া

মুসলমানরা আর কিছু না বুঝিলেও অন্ততঃ তাহাদের সহিত অপরাপর জাতির যে শত্রুতা রহিয়াছে তাহা তো সহজেই বুঝিতে পারে। কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও তাহারা প্রতারিত হয়। ইহার চেয়েও বড় ক্ষতির কথা এই যে, মুসলমানদের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ২১৬)

অন্য জাতিকে ভাই বানানো নিষ্প্রয়োজন

ইসলামের প্রতি অপরাপর জাতিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য তাহাদিগকে ভাই বানানোর প্রয়োজন নাই। শত্রুকে শত্রু জানিয়াও নিজের দিকে আকৃষ্ট করা যায়। অপরাপর জাতির প্রতি আমাদের কর্তব্য কি ইসলাম তাহাও নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। সেই কর্তব্য পালনই তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য যথেষ্ট। (কামালাতে আশরাফিয়া, পৃষ্ঠা ঃ ৭৬)

কংগ্রেসের সহিত শরীক হওয়ার পরিণাম

কাঠ যেভাবে নিজে জ্বলিয়া শেষ হইয়া হাড়ির ভিতরের খাবারকে তৈরী করিয়া দেয়, গান্ধীর সংগ্রেসের সহিত মুসলমানদের সহযোগিতাও হইয়াছে তেমনি। মুসলমানরা কংগ্রেসের সহিত হাত মিলাইয়া মৃত কংগ্রেসকে জীবিত করিয়া দিয়াছে আর নিজেরা শেষ হইয়া গিয়াছে। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ২৭১)

কংগ্রেসের উদ্দেশ্য

বলশেভিক যেভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করিয়াছে তাহা সবারই জানা। কংগ্রেসীরাও বলশেভিক চিন্তাধারার লোক। তাহাদেরও উদ্দেশ্য মুলমানদিগকে ভারত হইতে বহিষ্কৃত করা। (মফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ১৯২)

অমুসলিমগণ লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করিয়াছে। যদি মুসলমানরা তাহাদিগকে এই ভাবে হত্যা করিত তাহা হইলে তাহারাই উহাকে বর্বরতা বলিয়া চীৎকার শুরু করিয়া দিত। কিন্তু তাহারা মুসলমানদিগকে হত্যা করিলে তাহা হয় বিজ্ঞজনোচিত কাজ। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদিগকে ঈমানসুলভ দৃঢ়তা ও অপরিসীম ধৈর্য দান করিয়াছেন। তাই তাহারা সীমালংঘন করিয়া কাফেরদের উপরে জুলুম করিতে প্রয়াসী হয় নাই। বস্তুতঃ জুলুম কুফরীর সহিত একত্রিত হইতে পারে কিন্তু ঈমান ও জুলুম একত্রিত হওয়া মুশকিল। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ১৮৮)

শত্রু যদি মূর্খও হয়

কিছু কিছু নির্বোধ মুসলমান হিন্দুদিগকে নিজেদের মিত্র মনে করিয়া তাহাদের সাহায্য কামনা করে। এই অপরিণামদর্শীরা জানে না যে বুযুর্গগণ বলিয়াছেন, 'মূর্খ বন্ধুর চেয়ে জ্ঞানী শত্রুও ভাল।' আর শত্রু যদি মূর্খও হয় তাহা হইলে তো আর বলার কিছুই থাকে না। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ১৮৭)

শত্রুর মিত্রও শত্রুই বটে

রাষ্ট্রদ্রোহীদের সহিত সম্পর্ক রাখিলে বা তাহাদিগকে সাহায্য করিলে তাহাকেও রাষ্ট্রদ্রোহীরূপে গণ্য করা হয়। আমরা যদি কাহারও বিশ্বস্ত বন্ধু হই তাহা হইলে

তাহার শত্রুকে সাহায্য না করা পর্যন্ত আমরা তাহার বিশ্বস্ত বন্ধু থাকি। আর যে বন্ধু শত্রুর সহিত মিলিত হয় তাহাকে বিশ্বস্ত বন্ধু বলা হয় না। কারণ ইহা স্ববিরোধিতা। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ৪৯)

খারাপ লোকেরাই শত্রুর অনুসরণ করে

আমরা এমন লোকদের অনুসরণ করি যাহাদের শত্রুতার অবস্থা এই–

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ـ

(তোমরা যদি কল্যাণ লাভ কর তাহা হইলে তাহারা মনে কষ্ট পায় আর তোমরা বিপদে পড়িলে তাহারা খুশী হয়।) কিন্তু তবুও আমাদের হুঁশ হয় না। অথচ ইহার প্রতিকার তো এই–

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ـ

ইহার কারণ এই যে, আমাদের অন্তরে দ্বীনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নাই। তাই আমরা ধার্মিক লোকদিগকে স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ও নীচুমনা বলিয়া থাকি। এই বিকৃত মানসিকতার প্রতিকার কোথায়? (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ৯০)

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

মুসলমানরা শত্রু ও মিত্র চেনে না। তাই তাহারা খারাপ লোকদের অনুকরণ করিয়া কল্যাণ লাভ করিতে চাহে। অথচ মুসলমানদের কল্যাণ ও সাফল্য শুধুমাত্র আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। আমাদের ঘরে যে সম্পদ রহিয়াছে আমরা তাহার খোঁজ রাখি না। আমাদের কাছে যে সম্পদ আছে উহা সমগ্র পৃথিবীর রাজত্বের চেয়েও মূল্যবান। আর তাহা হইতেছে ঈমানের সম্পদ। উহার কদর করিতে হইবে। নেক আমলের দ্বারা ঈমান শক্তিশালী হয়। আমাদিগকে নেক আমল করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমাদের অবস্থার পরিবর্তন হইবে, নতুবা নহে। বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করিয়াই দেখ।

سالها تو سنگ بودی دلخراش * آزموں را یك زمانے خاك باش

চতুর্থ পাঠ

আন্দোলন ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা

শান্তি স্থাপনের উপায়

শরীয়তের আদেশ ও নিষেধ মান্য করিয়া চলিলে যাবতীয় ফেতনা-ফাসাদ দূর হয় এবং পৃথিবীতে নামিয়া আসে অনাবিল শান্তি। ইহাই কোরআনের শিক্ষা। ইহা ব্যতীত শান্তি লাভের অন্য কোন পথ নাই। কিন্তু মানুষ আল্লাহর শিক্ষা উপেক্ষা করিয়া শান্তি স্থাপনের জন্য নিত্য নতুন ফর্মূলা বাহির করে। (আত্তাআররুফ)

আন্দোলনের কুফল

বর্তমানকালের আন্দোলন সমূহে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী। আর নিয়ম হইল ক্ষতির চেয়ে লাভ বেশী হইলে ক্ষতিকেই প্রবল বলিয়া মনে করিতে হইবে। আর যে কাজে ক্ষতিই বেশী উহা কিরূপে বৈধ হইতে পারে? ভালো ও মন্দের মিশ্রণ মন্দই হইয়া থাকে। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৯)

মিছিল ও হরতাল

শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতির বিপরীত কোন পদ্ধতি অবলম্বন করাকে নিষিদ্ধই বলিতে হইবে। বিশেষতঃ যদি ঐ পদ্ধতি বেহুদা ও ক্ষতিকরও হয় তবে উহার হারাম হওয়া সম্বন্ধে আর সন্দেহ কোথায়? হরতাল ও মিছিল এই জাতীয়। ইহাতে রহিয়াছে সময় ও অর্থ ব্যয়, জনগণের অসুবিধা সৃষ্টি, নামায নষ্ট হওয়া প্রভৃতি। সুতরাং ইহা কিরূপে জায়েয হইতে পারে?

এই সব কাজের দ্বারা দ্বীনের কোন ফায়দা হয় না। আর তাহা ছাড়া অবৈধ কাজ ভালো নিয়তে করিলেও তাহা বৈধ হইতে পারে না। মিটিং করা, মিছিল করা, গলায় মালা পাওয়া এইগুলি তো নাম কুড়ানোর জন্যই। এই সব কাজ পাশ্চাত্যের অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নহে। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ১২৩)

মার খাওয়া ও জেলে যাওয়া

ক্ষমতা না থাকিলে এমন কোন কাজ করা যাহার পরিণতিতে মার খাইতে ও জেলে যাইতে হয়, শরীয়ত তাহা অনুমোদন করে না। ইহা না করিয়া প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ করাই উত্তম। ইসলামের স্বর্ণযুগে দুইটি পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। শক্তি থাকিলে মোকাবিলা করা আর শক্তি না থাকিলে ধৈর্যধারণ করা। ইহা

ব্যতীত আর সকল পদ্ধতিই মানুষের মনগড়া। ইহাতে কোন বরকত নাই। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৫)

সত্যাগ্রহ

ক্ষমতা থাকিলে জালেমের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। আর ক্ষমতা না থাকিলে ধৈর্যধারণ করাই শ্রেয়। ইহার মাঝামাঝি পন্থা, যাহাকে সত্যাগ্রহ বলা হয় ইহার উৎস আমার জানা নাই। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ২৪৩)

মুসলিম সুলতানদের অবমাননা

প্রকাশ্যভাবে মুসলিম সুলতানদের অবমাননা সকলের জন্য ক্ষতিকর। কারণ ভক্তি শ্রদ্ধা দূর হইয়া গেলে ফিতনা-ফাসাদ বাড়িতে থাকে। সুতরাং মুসলিম সুলতানগণকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে। (আনফাসে ইসা, পৃষ্ঠা ঃ ৩৭৫)

শাসকদের সমালোচনা

বিপদাপদে অতিষ্ঠ হইয়া অনেকে শাসকদিগকে গালি দিয়া থাকে। ইহা অধৈর্যের পরিচায়ক। হাদীসে আছেঃ لَا تَسُبُّوا الْمُلُوْكَ অর্থাৎ "শাসকদিগকে গালি দিও না। তাহাদের অন্তর আমার হাতের মুঠায়। তোমরা আমার আনুগত্য কর তাহা হইলে আমি তোমাদের জন্য তাহাদের অন্তরকে কোমল করিয়া দিব।" আর তাহা ছাড়া বিপদাপদ আল্লাহর তরফ হইতে আসে। আল্লাহ বলেনঃ

مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ "আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন বিপদ আসে না।" বিপদ যখন আল্লাহর তরফ হইতে আসে তখন তাহার প্রতিবিধান হইতেছে আল্লাহর প্রতি রুজু হওয়া। অতঃপর যাহা কিছু আসিবে উহাকে কল্যাণ মনে করিতে হইবে।

ہر چہ آں خسرو کند شیریں بود

শরীয়তের অনুমতি ব্যতীত চেষ্টা তদবির

শরীয়তের অনুমতি থাকিলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয আর অনুমতি না থাকিলে উহা শরীয়ত বিরোধী কাজ হইবে। আজকাল অনেক উৎসাহী যুবককে দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা দেশে অরাজক পরিস্থিতি কামনা করে। আল্লাহ না করুন এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে ইহারাই সবার আগে গা ঢাকা দিবে। শান্তিই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। আর যদি আপনা আপনিই কোন

বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয় তখন ধৈর্যের সহিত উহার মোকাবিলা করিবে। মহানবী (সঃ)-এর অভ্যাস এই ছিল যে, তিনি কখনও বিপদ কামনা করিতেন না। কিন্তু কোন বিপদ আসিয়া পড়িলে তখন উহা দূর করার চিন্তা করিতেন। ব্যাধি হইলে ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন। যুদ্ধের সময় হইলে শত্রুর মোকাবিলার ব্যবস্থা করিতেন।

ইসলামী ও অনৈসলামী আন্দোলনের পার্থক্য

জানা দরকার যে, যাহা খাঁটি দ্বীনি কাজ সেদিকে দুনিয়াদারগণ প্রথমে আকৃষ্ট হয় না। সুতরাং যে কাজের দিকে দুনিয়াদারগণ প্রথমেই আকৃষ্ট হয়, বুঝিতে হইবে যে, উহা খাঁটি দ্বীনি কাজ নহে। আর যে কাজের দিকে মুত্তাকীগণ প্রথমে আকৃষ্ট হন বুঝিতে হইবে যে উহা খাঁটি দ্বীনি কাজ। আর যদি ইসলামী ও অনৈসলামিক পদ্ধতির সমন্বয়ে কোন আন্দোলন গড়িয়া উঠে তবে উহা খাঁটি ইসলামী আন্দোলন হইতে পারে না এবং উহার অনুসরণ ওয়াজেব নহে। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ৯৪)

দুনিয়ার ফেতনা ও আখেরাতের চিন্তা

আন্দোলনের দিনগুলিতে আমার উপর দিয়া অনেক অত্যাচার গিয়াছে। আমি নিজেকে আল্লাহর হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম। একবার আমার অন্তরে একথা উত্থিত হইল যে, মৃত্যুর পরে কবর, হাশর, হিসাব নিকাশ ও পুলসেরাতের যে কঠিন মঞ্জিলগুলি আসিতেছে সেই তুলনায় দুনিয়ার এই সব ফেতনা ফাসাদ কিছুই নহে। তাই এইগুলির জন্য ভয় পাওয়া অনুচিত।

লোকে আমাকে এত নিপীড়ন করিয়াছে যে, আমার বাসার মেথরকে পর্যন্ত তাহারা আমার বাসায় কাজ না করার পরামর্শ দিয়াছে। উত্তরে মেথর বলিয়াছে, সব বাসার কাজ ছাড়িয়া দিলেও এই বাসার কাজ ছাড়িব না। ইহা আমার উপরে আল্লাহর মেহেরবানী।

আমাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হইয়াছে, আমার খানকা বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হইয়াছে, আমার পিছনে নামায না পড়ার সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে এবং এমনও রটানো হইয়াছে যে, আমি নাকি সি, আই, ডি'র নিকট হইতে টাকা পাই। আল্লাহর শোকর যে, আমাকে কাহারও দরজায় যাইতে হয় নাই। উহারাই পরে আসিয়া ক্ষমা চাহিয়াছে। আমি তাহাদিগকে এই নিয়তে ক্ষমা

করিয়া দিয়াছি যে, হয়তো ইহার উছিলায় আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। কারণ আল্লাহর কাছে আমিও তো অপরাধী। (আল-ইফাজাত, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৪ পৃষ্ঠা)

আন্দোলনে শরীক না হওয়ার কারণ

ইহা আমার উপর আল্লাহ তা'আলার ইহসান যে, শরীয়ত অনেকটা আমার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। তাই আমি শরীয়ত বিরোধী কাজ করিতেই পারি না। অন্যরা কোন বিশেষ ভাব বা আবেগের দ্বারা চালিত হইলে আমিও এই আবেগের দ্বারা চালিত। তাই ইহাতে কেহ যদি খুশী হয় হউক আর অসন্তুষ্ট হয় হউক। দেশ ও জাতির কোন কাজে লাগিলাম বলিয়া তোমরা আমাকে অপদার্থ মনে করিয়া ছাড়িয়া দাও। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ১৬২)

পঞ্চম পাঠ
জাতির নেতৃবৃন্দ

যুগের হাওয়া

সব যুগেই হাওয়ার একটা গতি থাকে। ছেলে বুড়ো সবাই সেই দিকে ধাবিত হয়। আধুনিক কালের হাওয়ার গতি হইতেছে খ্যতি অর্জন। তাই ছোট বড় সবাই খ্যাতি অর্জনের নেশায় মাতিয়াছে। আর উহারই জন্য চলিতেছে তাহাদের নিরন্তর প্রয়াস। (তেজারতে আখেরাত, পৃষ্ঠা ঃ ৬)

বিবেক বর্জিত

আমাদের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ বিবেক বর্জিত। সঠিক বিবেক বুদ্ধি না থাকিলে তাহারা ইসলামী হুকুম আহকাম বুঝিবে কেমন করিয়া! বিচার বুদ্ধি থাকিলে না হয় কিছুটা বুঝিতে পারিত। তদুপরি ইহাদের মধ্যে নামায রোযা তাকওয়া ইত্যাদিরও বালাই নাই। এই আমলগুলির দ্বারাও অন্তরে নূর পয়দা হয়। ইহার পরেও নেতারা শরীয়তের হুকুম আহকাম সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে। আর ওদিকে নিজদিগকে জাতির কাণ্ডারী রূপে অভিহিত করে। এমন লোকদের দ্বারাই মুসলমানদের ক্ষতি হইতেছে। ইহারা নিত্য নতুন ভোল পাল্টাইয়া জনসমক্ষে আসে। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ৮৪)

দ্বীনের শত্রু

ইহারা বন্ধু বেশে দ্বীনের শত্রু। ইহারা শরীয়তের হুকুম আহকামকে তুলিয়া দিতে চায়। ইহাদের মধ্যে কেহ বলে, সুদ বর্জন করিলে আমাদের উন্নতি হইবে না। কেহ বলে পর্দা প্রগতির অন্তরায়। ইহারাই আবার সমাজের নেতা ও জাতির কর্ণধার। অপরাপর জাতির বিরুদ্ধে ইসলামের অভিযোগ নাই। ইসলামের অভিযোগ এই বর্ণচোরা শত্রুদের বিরুদ্ধে–

من از بیگانگاں ہرگز نہ نالم * کہ مابن آنچہ کرد آں آشناکرد

(মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ১০৩)

জাহের ও বাতেন কোনটাই ঠিক নহে

ইহাদিগকে যদি বলা হয় যে, আপনাদের জাহের ও বাতেন কোনটাই ঠিক নাই। সুতরাং আগে আপনারা সংশোধন হউন। কারণ আপনারা জাতির নেতা, তাহা হইলে জনগণ আপনাদের অনুসরণ করিবে। তখন ইহারা বলে, এইগুলি আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনারা ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন কেন?

আমি বলিতে চাই, আপনারা যে আপনাদের মনগড়া ব্যাখ্যা দ্বারা শরীয়তের হুকুম আহকামের উপর হস্তক্ষেপ করিতেছেন তাহার খেয়াল আছে কি? জনগণও তো বলিতে পারে যে, আপনারা আমাদের আকিদা ও আমলের উপর হস্তক্ষেপ করিতেছেন। সুতরাং আপনাদিগকে মানিবার প্রয়োজন নাই। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৬)

ছাত্রদের বিপদ

ইহারা নিজেরা তো গোল্লায় গিয়াছেই তদুপরি ছাত্রদিগকেও রাজনীতির মাঠে নামাইয়াছে। আমার মতে ছাত্রদিগকে কোন আন্দোলনেই শরীক হইতে দেওয়া অনুচিত। ইহা তাহাদের ভবিষ্যতের জন্য ক্ষতিকর। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ৭)

মনে কষ্ট লাগে

এই কাজের জন্য ছাত্রদিগকে টানিয়া না আনিয়া জনসাধারণকে সঙ্গে নিলে কি চলে না? কিন্তু কে শোনে কাহার কথা? ইহার পরিণতি সম্বন্ধে ইহাদের কোন চিন্তা নাই। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ৬৯)

ওলামা ও নেতাদের কাজ

সবজাতির জন্যই দায়িত্ব বন্টনের প্রয়োজন। ইহা না হইলে কাজ হয় না। সুতরাং নেতৃবৃন্দ কোরআন-হাদীসের অর্থ ও শরীয়তের হুকুম আহকাম ওলামাদের নিকট হইতে জানিয়া লইবেন। আর জাতীয় উন্নতির পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে নিজেরা চিন্তা করিবেন। (আনফাসে ইসা, পৃষ্ঠা ঃ ৩৬০)

কর্ম বন্টন

সকলে মিলিয়া কাজ করার অর্থ এই নহে যে, সকলে একই কাজ করিবে বা একের কাজ অপরে করিবে। ইহা শরীয়ত বিরুদ্ধ তো বটেই বিবেক বিরুদ্ধও। প্রত্যেককে যার যার নিজের কাজ করা উচিত। তালগোল পাকাইয়া ফেলাতে কোন লাভ নাই। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ৮)

ধর্মীয় নেতার ধনী হওয়া জাতির জন্য অকল্যাণকর

যে জাতির ধর্মীয় নেতা বিত্তশালী হইবে সেই ধর্ম ও জাতি পথভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। কারণ তখন জনগণের সহিত তাহাদের আর সম্পর্ক রাখিবার প্রয়োজন হইবে না। ফলে তাহাদের পথভ্রষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। বিত্তের কারণেই যে জনগণের সহিত তাহাদের সম্পর্ক শিথিল হইয়া যাইবে তাহা নহে। আসলে বিত্তের মধ্যে গরীব মিসকীনদের নিকট হইতে দূরে থাকার প্রবণতা রহিয়াছে। (আল ইফাজাত, পৃষ্ঠা ঃ ১৮)

আল্লাহর সাহায্য লাভের শর্ত

যুদ্ধ সঙ্গত কারণেই হউক আর অবাঞ্ছিতভাবেই হউক মুসলমানদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন নাই। আর আল্লাহর সাহায্য লাভের শর্ত হইতেছে আল্লাহর হুকুম আহকাম মানিয়া চলা। ইহা হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া পরীক্ষিত। যতদিন পর্যন্ত মুসলমানরা সত্যিকারভাবে আল্লাহর গোলামী করিয়াছে দুনিয়া তাহাদের পায়ের তলায় আসিয়া লুটাইয়াছে। আর যতই ইহাতে তাহাদের শিথিলতা আসিয়াছে ততই তাহারা অবনতির দিকে চলিয়াছে।

আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের ঘটনা

হযরত ওমর (রাঃ) মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের জন্য আমর বিন আসের নেতৃত্বে তথায় এক বাহিনী প্রেরণ করিলেন। এই বাহিনী যেদিকেই যাইত বিজয় তাহাদের পদচুম্বন করিত। কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় করিতে গিয়া স্বাভাবিক নিয়মের চেয়েও বেশী সময় লাগিয়া গেল। অর্থাৎ তিনমাস কাল পর্যন্ত আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করিয়া রাখিতে হইল। হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে এই বিলম্ব অস্বাভাবিক মনে হইল এবং তিনি আমর বিন আস (রাঃ)-এর নিকট এক পত্র লিখিলেন। উহার বিষয়বস্তু ছিল এই– হামদ ও সালাতের পরে আরজ এই যে, আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ে এত বিলম্ব হওয়াতে আমি উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছি। আপনি তো সর্বদা জেহাদেই থাকিয়াছেন এবং এ ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতাও আছে। এত বিলম্বের কারণ শুধু ইহাই হইতে পারে যে, আপনাদের নিয়তের মধ্যে গোলমাল দেখা দিয়াছে এবং আপনারা আপনাদের শত্রুদের মতোই দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। নিয়ত খালেছ না হইলে আল্লাহ বিজয় দান করেন না। আপনি এই চিঠি পাওয়া মাত্র সৈন্যদিগকে জেহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করুন এবং তাহাদিগকে ইহাও বুঝাইয়া দিন যে, তাহাদের পদক্ষেপ যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের এবং দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে হয়। হযরত আমর বিন আস (রাঃ) এই চিঠি পাওয়া মাত্র সৈন্যদিগকে একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে খলিফার চিঠি পড়িয়া শুনাইলেন এবং সবাইকে অযু গোসল করিয়া দুই রাকাত নামায পড়িয়া আল্লাহর কাছে বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সৈন্যরা তাহার নির্দেশ পালন করিল। আর নামায ও দোয়ার পরে আল্লাহর সাহায্য লাভের ভরসা করিয়া এমন আক্রমণ চালাইল যে, শত্রুদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া গেল এবং আলেকজান্দ্রিয়া মুসলমানদের পদানত হইল।

উপদেশমূলক শিক্ষা ও গায়েবী সাহায্য

উপরে বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনাটিতে আমাদের জন্য এই শিক্ষা রহিয়াছে যে, মুসলমানদের ব্যর্থতার কারণ দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ এবং আল্লাহর সহিত সম্পর্কের শিথিলতা ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং আমাদিগকে আল্লাহর নাফরমানি ত্যাগ করিয়া আচার-আচরণে খাঁটি মুসলমান হইতে হইবে। তাহা হইলে আমরা অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য লাভ করিতে পারিব এবং বিজাতীয়রা আমাদিগকে ভয় করিয়া চলিবে।

মুসলিম লীগের প্রতি

.... আপনাদিগকে একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, মুসলমান শুধুমাত্র শরীয়তের পাবন্দী করিয়াই উন্নতি করিতে পারে। শরীয়তকে বাদ দিয়া মুসলমান উন্নতি করিতে পারে না। ..... আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করা ও ইসলামের হেফাজত আমাদের আসল উদ্দেশ্য হইতে হইবে। পার্থিব উন্নতি যেন আমাদের আসল উদ্দেশ্য না হয়। আমাদের চাল-চলন, উঠা-বসা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী হইতে হইবে। বিজাতীয়দের অনুকরণ বর্জন করিতে হইবে। .... ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতির উপায় সম্পর্কে আমি তানজিমুল মুসলিমীন এবং তাফহিমুল মুসলিমীন নামক প্রবন্ধদ্বয়ে কোরআন ও হাদীসের আলোকে বিশদভাবে আলোকপাত করিয়াছি। তদনুযায়ী আমল করা কর্তব্য।

ষষ্ঠ পাঠ
রাষ্ট্র

খাঁটি ধর্মীয় রাজনীতি

ইসলাম ধর্মের একটি অঙ্গ হইতেছে রাজনীতি। উহা সুনির্দিষ্ট এবং সেভাবেই উহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। উহা খাঁটি ধর্মীয় রাজনীতি এবং উহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। ইসলামী রাজনীতির নামে মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়া জায়েয নাই। যেমন আজকাল অনেককে এরূপ করিতে দেখা যায়। ইহারা সর্বত্র নিজের বুদ্ধি খাটাইতে চায়। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ৯৫)

জনগণতন্ত্র

গণতন্ত্র কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা আমাদের জানা নাই। ইহার ফল মানুষ নিজের চোখেই দেখিতেছে। কিন্তু মানুষের অভ্যাস এই যে, একবার যাহা মুখ দিয়া বাহির করিবে কেয়ামত হইয়া গেলেও উহা আর প্রত্যাহার করিবে না। অভিজ্ঞতা হইল, পর্যবেক্ষণ হইল– তবুও হঠকারিতা করিবেই। (আল ইফাজাত, পৃষ্ঠা ঃ ৫৪)

ব্যক্তির মত ও জনমত

আজকাল অধিকাংশ ব্যাপারেই সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এখানে বিবেচ্য এই যে, আমরা যাহাকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বলি উহা আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নহে। কারণ আমরা দশ বিশ বা একশত জনকে একত্রিত করিয়া তাহাদের মত লইয়া থাকি। আর উহাকেই সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বলিয়া চালাইয়া দেই। অথচ বহু লোক এমনও থাকে যাহাদের মত লওয়া হয় না।

আর যদি জনসাধারণের স্থলে বুদ্ধিজীবিদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মত লওয়া হয় তবে এখানেও প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, বুদ্ধিজীবিদিগকে বাছাই করা হইবে কোন মাপকাঠিতে? আর উক্ত মাপকাঠি যে সঠিক তাহারই বা প্রমাণ কি? ইহার পরেও কথা থাকিয়া যায়। পার্লামেন্ট যে আইন প্রণয়ন করে তাহা কি সর্বক্ষেত্রে জনগণের রায় অনুযায়ী হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে উহাতে জনমতের প্রতিফলন থাকে না। তবুও আমাদিগকে উহা মানিয়া লইতে হয়। তাহা হইলে এক ব্যক্তির শাসন মানিয়া চলিতে বাধা কোথায়?

সুতরাং আমাদিগকে ব্যক্তির মত ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বাদ দিয়া একমাত্র অহীর বিধান অনুযায়ী চলিতে হইবে। কারণ মানুষের সিদ্ধান্ত কখনও নির্ভুল

হইতে পারে না। একমাত্র অহীই নির্ভুল। অহীর বিধানকে যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞান অনুসারে যাচাই করিতে চায় সে মূর্খ। আর আজকাল তো মূর্খও নিজেকে মূর্খ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। ইহাও মূর্খতারই পরিচায়ক। (আয়াতুন্নাজাহ)

এক ব্যক্তির শাসন

সমাজের বুদ্ধিজীবিদের উচিত এমন একজনকে বাদশাহ নির্বাচিত করা যিনি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে সক্ষম এবং যাহার উপরে আমরা পুরাপুরিভাবে আস্থা স্থাপন করিতে পারি। আমি বাদশাহকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও পরিপক্ক জ্ঞানী বলিয়া বিশ্বাস করি বলিয়াই এক ব্যক্তির শাসন সমর্থন করি। কিন্তু লোকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে এই জন্য সমর্থন করে যে, তাহারা বাদশাহকে দুর্বলমনা ভাবিয়া থাকে। তাহারা যদি বাদশাহকে বলিষ্ঠ মতের অধিকারী বলিয়াই ভাবে তবে আর সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে সমর্থন করিতে যাইবে কেন? (আশরাফুল জওয়াব, পৃষ্ঠা ঃ ২৪)

ইসলামের শক্তির ভিত্তি

ইসলামের শক্তি বাহিরে নহে, ভিতরে। ইসলামের শক্তির ভিত্তি উহার সত্য হইবার উপরে। অনুসারীদের সংখ্যাধিক্যের উপরে উহার শক্তির ভিত্তি নহে। হক এর মধ্যে এমন শক্তি নিহিত রহিয়াছে যে, যদি এক ব্যক্তি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং সমস্ত পৃথিবী তাহার বিরুদ্ধে চলিয়া যায় তবুও সে আল্লাহর কাছে দুর্বল নহে। আর যদি এই ব্যক্তি বাতিলের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমস্ত পৃথিবী তাহার পিছনে থাকে তবুও আল্লাহর কাছে সে দুর্বল বলিয়াই বিবেচিত হইবে। (আল ইফাজাত, পৃষ্ঠা ঃ ১২)

শরীয়তের আইন জনস্বার্থ বিরোধী নহে

কোন আইনই ব্যক্তিস্বার্থের হেফাজতের জামিন হইতে পারে না। কারণ ব্যক্তিস্বার্থ পরিষ্কারভাবে আপাতঃ বিরোধী হইয়া থাকে এবং ঐগুলির একত্রিত হওয়া অসম্ভব। তাই আইন জনস্বার্থের হেফাজত করিয়া থাকে। ইসলামী আইনও জনস্বার্থের বিরোধী নহে। (দ্বীন ও দুনিয়া, পৃষ্ঠা ঃ ৭২৬)

ওলামা ও মুসলিম সুলতানদের সমঝোতা

মহানবী (সঃ)-এর চরিত্রের দুইটি দিক ছিল। তিনি ছিলেন একাধারে নবী ও শাসনকর্তা। খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যেও এই উভয়বিদ শান বর্তমান ছিল। আধুনিক কালে এই দুইটি শান দুই দলের মধ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। আলেম সমাজ শানে নবুওয়াতের ধারক ও বাহক আর সুলতানগণ শানে সালতানাত-এর

ধারক ও বাহক। এখন বাদশাহগণ যদি আলেম সমাজের ধার না ধারেন তাহা হইলে তাহাতে মহানবী (সঃ)-এর একটি শানকে উপেক্ষা করা হয়। আর আলেম সমাজ যদি বাদশাহদের বিরোধিতা করেন তাহা হইলে মহানবী (সঃ)-এর অপর একটি শানকে মানিতে অস্বীকার করা হয়। উভয় শানের সমন্বয় এইভাবে হইতে পারে যে, বাদশাহগণ আলেম সমাজের মত না লইয়া কোন আইন জারী করিবেন না। আর আলেম সমাজের কাজ হইবে আইন জারীর পরে উহা মানিয়া চলা। এভাবে মহানবী (সঃ)-এর দুইটি শান একত্রিত হইলে মুসলমানদের কল্যাণ হইবে। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ২২১)

ছোটখাট বিষয়ে গাফলতি

ছোটখাট বিষয়ে গাফলতির কারণে মুসলমানদের রাজ্য গিয়াছে। কারণ এই সব ছোটখাট গাফলতিই একত্রিত হইয়া গাফলতির সমষ্টিতে পরিণত হয় এবং উহাই পরিণামে সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

তাহা ছাড়া ছোটখাট বিষয়ে গুরুত্ব না দিলে গাফলতির অভ্যাস হইয়া যায়। ফলে পরিণামে বড় বড় বিষয়েও গাফলতি হইতে থাকে। আর ছোটখাট বিষয়ে গাফলতি করিলে পারস্পরিক মিলামিশাতে ও গাফলতি করা হয়। ফলে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিতে চিড় ধরে। আর পারস্পরিক ঐক্যের উপরেই সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা।

সবকিছুরই উত্থান পতন আছে

সাম্রাজ্য হউক আর শক্তি সামর্থ্য হউক, ধন ও মান হউক, আর বিদ্যা বুদ্ধি হউক একটা নির্দিষ্ট সময়ে সবকিছুরই পতন আসে। যখন মানুষ এইগুলিকে আল্লাহর দান মনে না করিয়া নিজের কৃতিত্ব বলিয়া মনে করে তখনই এইগুলির পতন আসে। ইহার কারণ এই যে, যখন মানুষ এইগুলিকে নিজের কৃতিত্ব বলিয়া মনে করে তখন সে এইগুলির হক সম্পর্কে উদাসীন হইয়া যায় আর তখনই আল্লাহ এই আমানতকে তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লন। (আল ইফাজাত, পৃষ্ঠা ঃ ২২৭)

বনী ইসরাঈলদের কাহিনী হইতে শিক্ষা গ্রহণ

বনী ইসরাইলগণ বিপদে ধৈর্যধারণ করিত না, নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করিত না এবং আল্লাহর তকদীরে তাহারা সন্তুষ্ট ছিল না। তাই তাহাদের অন্তরে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা জন্মাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদের উচ্চ মর্যাদাগুলি ছিনাইয়া লওয়া হয় ও তাহাদিগকে চির লাঞ্ছিত জাতিতে পরিণত করা হয়।

আল্লাহ ওয়ালাদের জন্য তাহাদের ঘটনাবলী হইতে অনেক কিছুই শিখিবার আছে। (তাফসীরে মাজেদীর টীকা, পৃষ্ঠা ঃ ২১২)

মোগল সাম্রাজের পতনের কারণ

আলমগীরের কারণে মোঘল সাম্রাজ্যের পতন আসে নাই। আকবর বিজাতীয়দের প্রশাসনিক কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ দিয়া প্রশাসনের বাগডোর তাহাদের হাতেই ছাড়িয়া দেয়। এভাবে আকবরই মোঘল সাম্রাজের পতনের জন্য দায়ী। (আনফাসে ইসা, পৃষ্ঠা ঃ ২৯৮)

রাজনীতিতে কাফেরদের নেতৃত্ব

রাজনীতিতে কাফেরদের নেতৃত্ব মানিয়া লওয়া যায় কি-না এই প্রশ্ন তখনই ওঠে যখন মানুষ মনে করে যে, ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা। অথচ এরূপ ধারণা করা চরম মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নহে। ইসলামে রাজনীতি দ্বীনেরই অঙ্গ। সুতরাং রাজনীতিতে কাফেরদের নেতৃত্ব মানিয়া লওয়া অর্থ দ্বীনী বিষয়ে কাফেরদের অনুসরণ করা। তাহা কি সম্ভব? ধরা যাক, মুসলমানরা নামায জানে না এবং জনৈক কাফের নামায সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখে। এখন নামাযের ব্যাপারে ঐ কাফেরের এক্তেদা করা জায়েয হইবে কি? অধিকন্তু রাজনীতিতে কাফেরদের নেতৃত্ব মানিয়া লওয়া ইসলাম ও মুসলমানদের অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নহে। আর তাহা ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিবার মতো কেহই কি নাই? তবে হাঁ, যদি নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতে থাকে তবে রাজনীতিতে সহযোগী হিসাবে কাফেরদিগকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। (আল ইফাজাত, পৃষ্ঠা ঃ ১৫২)

সফলতার আসল চাবিকাঠি

আল্লাহ ব্যতীত মুসলমানদের আর কোন সাহায্যকারী নাই এবং অন্য কাহারও প্রয়োজনও নাই। মুসলমানরা যদি দ্বীন এবং শৃংখলা মানিয়া চলে তাহা হইলে আজও সারা দুনিয়ার কাফেররা মুসলমানদের কিছুই করিতে পারিবে না। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে পথ ধরিয়া দ্বীন ও দুনিয়ার সফলতা অর্জন করিয়াছিলেন আমাদিগকেও সেই পথ ধরিতে হইবে। আজ আমরা কাফেরদিগকে জ্ঞানী বলিয়া ভাবি এবং তাহাদের অনুসরণ করিতে চাই। পরিণামের (আখেরাতের) চিন্তা যাহাদের নাই তাহারা কি জ্ঞানী হইতে পারে? অর্থ-সম্পদ ও সাম্রাজ্য থাকিলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না। তাহা হইলে শাদ্দাদ, ফেরাউন ও নমরুদকে জ্ঞানী বলিতে হয়। তাহাদের সবই ছিল কিন্তু দ্বীন ছিল না। তাই তাহারা ধ্বংস হইয়াছে। আর ফেরাউন ও নমরুদদের যাহা ছিল আধুনিক যুগের

কাফেরদের তো তাহাও নাই। সুতরাং আমরা উহাদের অনুসরণ করিতে যাইব কোন দুঃখে? (আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়া)

আমাদের পরাধীনতার কারণ

ভারতবর্ষে কাফেররা যে আমাদের উপর রাজত্ব করিতেছে তাহা তাহাদের কোন যোগ্যতার কারণে– এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। বরং আমাদের অযোগ্যতার কারণে তাহাদিগকে আমাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই অযোগ্যতা যদি আমরা দূর করিতে পারি তাহা হইলে আবার আমরা রাজা হইব এবং অন্যরা প্রজা। (আল ইফাজাত, পৃষ্ঠা ঃ ৫৩)

রাষ্ট্রের পক্ষে দ্বীনের উন্নতি বিধান সহজ

হযরত ওমর (রাঃ) একবার বলিয়াছিলেন, ফকিহগণই বাজারে দোকান দিবে। তাহার কথার অর্থ এই ছিল যে, তাহাদের কাছে যত ক্রেতা আসিবে তাহারাও ক্রয়-বিক্রয়ের মাসআলা তাহাদের নিকট হইতে সহজেই শিখিয়া লইবে। এই পদ্ধতিতে তিনি সমগ্র দেশকে শিক্ষাঙ্গন ও খানকায় পরিণত করিয়াছিলেন। ইহা ছিল একটি সূক্ষ্ম চিন্তা। বস্তুতঃ রাষ্ট্রের দ্বারা সব কাজ সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমার একটি ঘটনা মনে পড়িল। বাদশাহ আলমগীর ছাত্রদের দুর্দশা দেখিয়া বায়তুল মালের উপর চাপ সৃষ্টি না করিয়া কিরূপে তাহাদের দুর্দশা লাঘব করা যায় তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি হাউজ হইতে ওযু করিতেছিলেন। তাহার পাশে ছিল জনৈক ধনী ব্যক্তি। তিনি পরীক্ষাচ্ছলে ধনী ব্যক্তিটিকে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকটি উত্তর দিতে পারিল না। আলমগীর রাগিয়া গিয়া বলিলেন, এই শহরে এত আলেম ও তালেবে এলম থাকিতেও তুমি কি তাহাদের নিকট হইতে দুই চারটি মাসআলাও শিখিয়া লইতে পার নাই? ইহাতে ধনীদের মধ্যে হৈচৈ শুরু হইয়া গেল এবং আলেমদের কদর বাড়িয়া গেল। ধনীরা আলেম ও তালেবে এলমদিগকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া নিজের বাড়িতে আনিয়া ঠাঁই দিতে লাগিল। রাষ্ট্রের প্রভাব এমনই হইয়া থাকে।

লোকে বলিয়া থাকে যে, রাজা নির্বোধ হইলেও চলে কিন্তু উজীরকে অবশ্যই জ্ঞানী হইতে হইবে। ইহা ভুল কথা। রাজাকে অবশ্যই জ্ঞানী হইতে হইবে। তাহা না হইলে তাহাকে উজীরের বশ হইয়া থাকিতে হইবে। আর সেক্ষেত্রে উজীরই হইবে রাজা এবং রাজা হইবে তাহার উজীর। (আল ইফাজাতুল ইয়াওমিয়া)

সপ্তম পাঠ

মুসলমানদের স্বাধীনতা ও পরাধীনতার অর্থ কি?

বল্গাহীন স্বাধীনতা নিন্দনীয়

একজন আলেম বলিতেছিলেন যে, ভালোই হইয়াছে, আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হইতে যাইতেছে। আমি বলিলাম, স্বাধীনতা তো দুষ্কৃতিকারীদের মধ্যেও জন্ম নিতেছে। নিজেদের কল্যাণের চিন্তা করুন। ইহার পরে তিনি আর কোন কথা বলেন নাই। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ২১৭)

প্রকৃত স্বাধীনতা

স্বাধীনতা কাহাকে বলে? হক হইতে মুক্ত হওয়ার নাম কি স্বাধীনতা না নাহক হইতে মুক্ত হওয়ার নাম স্বাধীনতা? মুমিনের জন্য তো হক এর গোলামী গৌরবজনক এবং উহাতেই রহিয়াছে তাহাদের সাফল্য ও কল্যাণ। তাহারা হক-এর গোলামী করিয়া দুনিয়ার সমস্ত বাধা-বন্ধন ও ঝামেলা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। এমন গোলামীর পদতলে লক্ষ স্বাধীনতাকে উৎসর্গ করা উচিত। আর যাহারা স্বাধীনতার দাবী করেন তাহারা স্বাধীনতার নামে মানব রচিত হাজারটা আচার-অনুষ্ঠান ও বিধি-নিষেধের জালে বন্দী। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ২৮)

যে গোলামী গৌরবের

মানুষ প্রাকৃতিকভাবেই গোলামী হইতে মুক্ত হইতে পারে না। তাহাকে কাহারও না কাহারও গোলামী করিতেই হইবে। গোলামী যখন করিতেই হইবে তখন তাহারই গোলামী করা উচিত যাহার গোলামী করিতে রাজা-বাদশাহ্রাও গৌরব বোধ করে। আর আল্লাহর গোলামী মানুষকে অপর মানুষের গোলামী হইতে মুক্তি দেয়। (আশরাফুল উলুম, পৃষ্ঠা ঃ ৪৪)

শরীয়তের আইন-কানুন মানিয়া চলিতে গেলে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয় ঠিকই। কিন্তু একথাও তো সত্য যে, যে কোন রাষ্ট্রে বাস করিতে গেলে ঐ রাষ্ট্রের আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হয়। সেক্ষেত্রেও তো ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়। সর্বোচ্চ স্বাধীনতা হইল কোন প্রকার আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধ না মানা। কিন্তু এমন বল্গাহীনভাবে চলা কি কেহ সমর্থন করিতে পারেন? আমরা রাষ্ট্রের ও সমাজের সকল প্রকার আইন-কানুন, বিধি-নিষেধ ও রীতিনীতি নির্দ্বিধায় মানিয়া চলি। কিন্তু আল্লাহর আইন মানিয়া চলিতেই আমাদের যত আপত্তি। (তরিকুন নাজাত)

তুমি কি তোমার নিজের?

ভালো লাগুক আর নাই লাগুক যে কাজ জরুরী তাহা করিতেই হইবে। ভালো লাগা পর্যন্ত প্রতীক্ষা করা– সে তো আর এক যন্ত্রণা। সত্যি করিয়া বল তো তুমি কি তোমার নিজের? (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮০)

অনেক লোক এই প্রতীক্ষায় থাকে যে, আগে কাজে মন বসুক তারপর কাজ শুরু করিব। আর কাজ এই প্রতীক্ষায় থাকে যে, আগে তুমি আমাকে শুরু করিয়া দাও তারপর আমি উহাতে তোমার মন বসাইয়া দিব। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ১১৫)

একজন ছাত্র চিঠিতে জানাইল যে, আমি নামাযকে জরুরী মনে করি। কিন্তু মন নামাযের দিকে ধাবিত হইতে চায় না। আর ধাবিত হইলেও উহাতে স্বাদ পাই না। আমি তাহাকে জবাবে লিখিলাম, নামাযের দিকে মন ধাবিত হওয়া জরুরী, না মনকে ধাবিত করা জরুরী? আর নামাযে স্বাদ পাওয়া জরুরী, না নামাযের আমল জরুরী? (আশরাফুস সাওয়ানেহ, পৃষ্ঠা ঃ ১২৬)

দ্বীনের কাজ করিতে বলিলে লোকে বলে, মন চায় না, স্বাদ পাই না ইত্যাদি। সরকারী আইন-কানুন যদি আমাদের ইচ্ছার বিপরীত হয় তখন কি কেহ বলিতে পারে যে, ইহাতে আমার মন চায় না? ধরা যাক, সরকার খাজনা দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছে। তখন কি কাহারও একথা বলার অধিকার থাকে যে, এখন খাজনা দিতে আমার মন চায় না। সুতরাং আমি এখন খাজনা দিতে রাজী নই। এরূপ বলিলে জেলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আল্লাহর সহিত যদি আমাদের ভালোবাসা নাও থাকে তবুও যেহেতু আমরা তাহার রাজত্বে বাস করি তাই তাহার আইন মানিয়া চলিতে আমরা বাধ্য। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ২৫৪)

তথাকথিত স্বাধীনতার দাবীদারদের প্রতি

হযরত ওমর (রাঃ) রাত্রিবেলা ঘোরাফিরা করিতেছিলেন। এমন সময় একটি ঘর হইতে গানের আওয়াজ ভাসিয়া আসিল। তিনি দরজা খুলিতে বলিলেন। কিন্তু তাহারা গানে এতদূর মত্ত ছিল যে, তাহারা হযরত ওমর (রাঃ)-এর আওয়াজ শুনিতে পায় নাই। অবশেষে হযরত ওমর (রাঃ) পিছনের দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ)-কে দেখিতে পাইয়া তাহারা ভয় পাইয়া গেল। কিন্তু তাহারা জানিত যে হযরত ওমর (রাঃ) শরীয়ত বিরোধী কাজ না হইলে রাগান্বিত হন না। তাই তাহাদের মধ্য হইতে একজন সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, হে আমিরুল মুমিনীন! আমরা শুধু তো একটি গোনাহই করিয়াছি, আর আপনি তিনটি গোনাহ করিয়াছেন। প্রথমতঃ আপনি বিনানুমতিতে ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। আর কোরআনের নির্দেশ হইল–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا

দ্বিতীয় এই যে, আপনি আমাদের দোষ অনুসন্ধান করিয়াছেন। আর কোরআনে অপরের দোষ খুঁজিতে নিষেধ করা হইয়াছে- وَلَا تَجَسَّسُوْا। তৃতীয় এই যে, আপনি পিছনের দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন। আর কোরআনের নির্দেশ হইল-

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি আমার গোনাহ হইতে তাওবা করিতেছি। তোমরাও তোমাদের গোনাহ হইতে তাওবা কর।

তথাকথিত স্বাধীনতার দাবীদারদের জন্য এই ঘটনার মধ্যে শিক্ষা রহিয়াছে। সাহাবাদের যুগে কি স্বাধীনতা ছিল না? না তথাকথিত এই প্রগতিবাদীরাই শুধু স্বাধীনতা ভোগ করে? নামায রোযার সাথে কোন সম্পর্ক নাই। পশুর মতো শুধু খাও আর ঘুমাও- ইহাই কি স্বাধীনতা? ইহাকে স্বাধীনতা বলে না। ইহাকে শুধু প্রবৃত্তির দাসত্ব ও সেচ্ছাচারিতাই বলা যায়। ইহা তো ষাঁড়ের স্বাধীনতা। যে ক্ষেত্রে খুশী মুখ দিল। যেদিক খুশী চলিয়া গেল। মানুষ কি ষাঁড়ের মতো চলিতে পারে? (নিসইয়ানুন নাফস)

পৃথিবীতে কেহই স্বাধীন নহে

পৃথিবীতে কেহই স্বাধীন নহে। কেহ আল্লাহর অধীন আর কেহ শয়তানের অধীন। এখন তুমিই চিন্তা করিয়া দেখ যে, তুমি কাহার অধীনে থাকা পছন্দ করিবে? (তরিকুল কালান্দার, পৃষ্ঠা ঃ ১৩)

আমাদের অযোগ্যতার দরুন কাফেরদের ক্ষমতালাভ

কাফেররা যে আমাদের উপর রাজত্ব করিতেছে তাহা তাহাদের কোন যোগ্যতার কারণে নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের অযোগ্যতার দরুন আল্লাহ তাহাদিগকে আমাদের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন। যদি আমরা আমাদের অযোগ্যতাকে দূর করিতে পারি তাহা হইলে অবস্থা ভিন্নরূপ হইবে। (মলফুজাত, পৃষ্ঠা ঃ ৫৩)

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)-এর বাংলায় অনূদিত কিতাব সমূহের তালিকাঃ

ইছলাহুল মুসলিমীন	৫০.০০
তাফসীরে আশরাফী ১-৬ খণ্ড সমস্ত	১৬৩৮.০০
বেহেশতী জেওর ১-৩ খণ্ডে	৩৬৯.০০
মাওয়ায়েযে আশরাফীয়া	৪৭৪.০০
খোৎবাতুল আহকাম	১০৫.০০
পথহারা উম্মতের পথ-নির্দেশ	১৮০.০০
যুক্তির আলোকে ইসলামের বিধান	১৩০.০০
হায়াতুল মোছলেমীন	৭৬.০০
তালিমুদ্দীন	৭০.০০
ফরউল ঈমান	৬৮.০০
ইসলামের দৃষ্টিতে নারী	৮০.০০
শরীয়ত ও তরীকত	১৪৫.০০
সুখ দুঃখ কেন	৩২.০০
কছদুছ ছবীল	৩২.০০
ছাফায়ি মোয়ামালাত	১৮.০০
ইসলাহে নফস	১২.০০
আদাবে জিন্দেগী	৫৫.০০
আদাবুল মোয়াশারাত	৫০.০০
আমলে কোরআনী	৫০.০০
দ্বীনদার স্বামী দ্বীনদার স্ত্রী	৫০.০০
তালিমুন নিসা	১০০.০০
রূহে তাছাওয়াফ	৭২.০০
মুমিন ও মুনাফিক	৫০.০০
নশরুততীব	১২৫.০০
নির্বাচিত ঘটনাবলী	৮০.০০
ইছলাহুর রুসুম	৫৫.০০
শরীয়তের দৃষ্টিতে সন্তান প্রতিপালন	৫০.০০

প্রাপ্তিস্থান

হাবিবিয়া বুক ডিপো

১৬, আদর্শ পুস্তক বিপণী বিতান

বায়তুল মোকররম, ঢাকা-১০০০